ব্যবসায়ে ফল ও ফুল

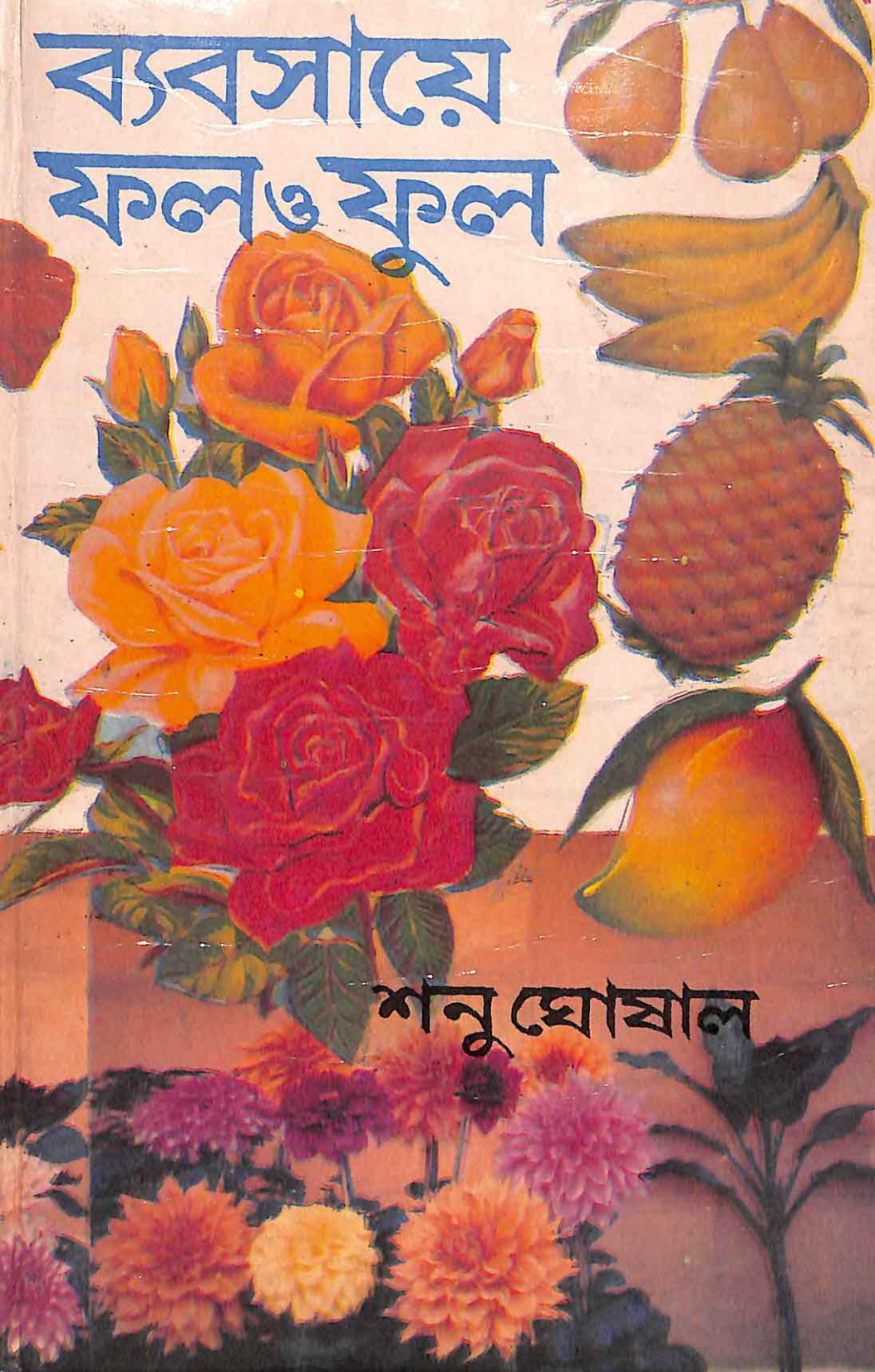

শনু ঘোষাল

१८९४

6
F
6

ব্যবসায়ে ফল ও ফুল

শম্ভু ঘোষাল

আজকাল, যুগান্তর, বর্তমান, ভারতকথা, পরিবর্তন, কর্মক্ষেত্র,
কোলকাতার কাছে, বর্তমান-দিনকাল, কিশোর মন
প্রভৃতি দৈনিক-সাপ্তাহিক-পাক্ষিকের লেখক।

শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রকাশক :
অরুণ পুরকায়স্থ
শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী
৭৯, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ : মার্চ ১৯৮৮

মূল্য : ১৮.০০

মুদ্রাকর :
শ্রীঅজিত চৌধুরী
সাধনা প্রেস
৪৫/১এফ, বিডন ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬

Acc No - 15282

॥ ফল-ফুলে সুধা নিরবধি ॥

বাজারে বাংলায় ফল-ফুল সংক্রান্ত বই নিশ্চয়ই কিছু আছে। কিন্তু "ব্যাবসায়ে ফল ও ফুল" সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা। অর্থাৎ এই বইটা পড়ে যাতে বাংলা ভাষাভাষি বেকার ভায়েরা তাদের বেকারত্ব ঘোচাবার কোন নিশানা পায়। ফল-ফুল ব্যবসায়ের প্রায় গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত সবকিছু আলোচনা করা হয়েছে। গাছের কাটিং, গাছ, হরমোন, ওষুধপত্র, যন্ত্রপাতি কোথায় পাওয়া যাবে তার দেশ বিদেশের বেশ কিছু ঠিকানা দেওয়া হয়েছে। সম্ভাব্য বাজার নিয়ে আলোচনাও করেছি। এক-কথায় এই বইটা পড়ে এবং হাতে-কলমে কিছু কাজ করে মানুষ সরাসরি ব্যবসায়ে নামতে পারে। নতুন জীবিকার সন্ধান—লন তৈরি করা, ঘর বারান্দা সাজান, বনসাই বানানর কিছু সুলুক-সন্ধান দেওয়া হয়েছে। বইটা কয়েক ফর্মার বলে গরমের দেশের অপ্রয়োজনীয় ফল-ফুলের আলোচনা করিনি। তাছাড়া আমি বিশ্বকোষ রচনা করতে যাচ্ছি না। আমি চাই বেকারত্বের ভারে যাঁদের ঘাড় নিচু তাঁরা যেন ব্যবসায়ে নেমে নিজের ঘাড়টা স্বনির্ভরে দাঁড়িয়ে সোজা করে রাখতে পারেন। তাই আপাতঃ ফেলনা মোরগঝুঁটি ফুল ও ফলসা ফলের সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছে। আলোচনা করা হয়েছে বিদেশের সঙ্গে ফল-ফুলের ব্যবসায়ের সম্ভাব্য পথগুলির। ফ্রিজ ছাড়াও ফল-ফুল তরি-তরকারি বেশ কিছুদিন টাটকা রাখা যায় তার অভিনব এক পন্থা দেখিয়েছি এই বইটায়।

বইয়ের ঢাক লেখকের না পেটানোই ভাল। এবার আসা যাক কৃতজ্ঞতার কথায়। যাঁদের বাগানে গিয়ে কাজ শিখেছি তাঁদের সকলের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞ আমি বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের ভাই-বোনদের কাছে যাঁরা আমাকে বইটা লেখার সময় দরকারি বইপত্র-পত্রিকা জুগিয়ে গেছেন।

নির্ভীক প্রকাশক শ্রীঅরুণকুমার পুরকায়স্থ আমার আগের বইগুলির মত ব্যবসায়ে ফল ও ফুল-এর মত অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বইটা প্রকাশ করে আমাকে আবার গুণীজনের ঋণে বেঁধে রাখলেন।

দোলপূর্ণিমা ১৩৯৪ শম্ভু ঘোষাল
ফুলিয়া, নদীয়া

॥ উৎসর্গ ॥

৺ ফুলদি (সর্বাণী ঘোষাল)-কে
ফল-ফুল যে ভালবাসতো,
জানিনা কোন অভিমানে আমাদের ছেড়ে চলে গেলো,
ফুলদি গো, ফল-ফুল তোমারই তো উপযুক্ত
তাই ফুলদি,
গ্রহণ করো আমার এই শ্রদ্ধাঞ্জলি !!

● প্রকাশকের নিবেদন ●

সামনে আশা থাকলে মানুষের কাজে আগ্রহ ও উৎসাহ হয়। সবচেয়ে বড় কথা হলো উপার্জনের পথ-নির্দেশিকা দরকার। আমরা অন্ধকারে হাতরে চলি। অথচ একটু ভাবনা চিন্তা করে কাজে নেমে গেলে নবদিগন্তের ছোঁয়া লাগে।

আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গে বহু যুবক নানা বিষয়ে পারদর্শী হয়েও বেকার জীবনযাপন করে। পরিশ্রম ও উদ্যোগের অভাব নেই কিন্তু পথের সন্ধান ওরা পায় না।

এই শ্রেণীর বই প্রকাশ করার পেছনে রয়েছে শিক্ষিত যুবকদের ব্যবসাতে আগ্রহ সৃষ্টি করা। স্বল্প মূলধন নিয়ে কি ভাবে বা ভালোভাবে জীবিকা চালান যায় তার নির্দেশ দিয়েছেন লেখক। আশা করি তরুণ-তরুণীদের এতে উৎসাহ সৃষ্টি হবে।

একটি দেশ বড় হয় সম্মিলিত চেষ্টায়। ইজরাইল ১৯৪৮ সালে মরুভূমি ছিল। আজ সেই দেশ এক শস্যশ্যামলা, ফলে-ফুলে ভরা দেশ। বহু কোটি টাকার ফল-ফুল বিদেশে রপ্তানী করে। আমরা কি বসে থাকবো? তবে বইটায় "ব্যবসায়" কথাটা থাকলেও সবটাই ব্যবসায়ে নেই। মুণিজনের আপ্ত-বাক্য আমরা সব সময়ে মেনে চলি—"যে ফুল এবং শিশু ভালোবাসে না সে খুন করলে আশ্চর্য হবার খুব একটা কারণ নেই।" আমরা এ কথাও বলবো না এই বইটা না পড়লে ভবিষ্যতে খুনের দায়ে কাঠগড়ায় উঠবেন।

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

কেন ফুল চাষ করব : ১

ফল-ফুল চাষের সুবিধা—১ ; ধান-আখ-রজনীগন্ধা-গোলাপ ও গ্লাডিওলাসের তুলনামূলক চাষ ও লাভ—৩ ; ৮ কাঠা জমিতে রজনীগন্ধা ফুলের চাষ—৫ ; ৬ কাঠা জমিতে গ্লাডিওলাস ফুল চাষ—৬।

ফল-ফুল চাষের নানাদিক : ৭

ফল-ফুলের সবচেয়ে বেশি ব্যবহার পূজায়—৭ ; আপনার বাড়ি সাজাতে—৭ ; অফিস সাজাতে—৮ ; ফুলের গহনা-গাড়ি-খাট-চেয়ার বা সিংহাসন সাজাতে—৮ ; বনসাই, ফুল থেকে ওষুধপত্র প্রভৃতি—৯ ; ফল-ফুল বিদেশে রপ্তানি—১০ ;

বিদেশে ফল-ফুলের আমদানি-রপ্তানি : ১২

ফলকে পচতে না দিয়ে সংরক্ষণ করা, চাষবাস, ট্রেনিং শিক্ষা প্রভৃতি : ১৩

ফল-ফুল কলকাতায় সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয়—১৪।

খ্যাত-অখ্যাত কিছু ফল-ফুল চাষি ভাইয়ের পরিচয় ১৪

এ. কে. দেওয়ান, দেওয়ানবাড়ি, খড়দহ—১৪ ; জগুবাবুর বাগান—১৫ ; নবকুমার দাস 'শান্তি নার্শারি' হাতিকান্দি, জিরাট, হুগলি—১৬ ; শ্রীমতিলাল হালদার, কৃষিপল্লী, ফুলিয়া, নদীয়া—১৭ ; গাছ ও তার ফল-ফুলের পরিচয়—১৮ ; মুকুল—১৯ ; মাটির তলার কাণ্ড; ফল-ফুল ব্যবসায়ে যার ভূমিকা আছে—১৯ ; বীজ—১৯ ; করমা বা গেঁড়—২০ ; রাইজোম—২০ ; গাছের পাতা—২০ ; ফুল—২০ ; ফল-বীজ—২২ ; মাটি—২৩ ; কি ভাবে মাটি চিনবেন—২৫ ; মাটি সংশোধন—২৫ ; মাটির অম্লতার সংশোধন—২৬ ; লাবণিক মাটি সংশোধন—২৬ ; ক্ষারীয় মাটির সংশোধন—২৭।

বিষয় পৃষ্ঠা

যে কোনো মাটিতেই ফল-ফুল চাষ সম্ভব : ২৮

চুন—২৮ ; জল—৩০ ।

কত ধরনের সেচ ফল-ফুল বাগানে করা যায় এবং তার

সুবিধা ও অসুবিধা : ৩০

আন্তর্ভূমির সেচ—৩১ ; ফল-ফুল বাগানে জলের পরিমাণ—৩১ ; কিভাবে মাটির আর্দ্রতা মাপবেন—৩২ ; চাষের জমির জল নিকাশ—৩২ ; গাছের খাবার ও সার—৩৩ ; পাতা সার—৩৬ ।

জমিতে কতটা খাবার বা সার দিতে হবে : ৩৬

বাগান তৈরির আগে অল্প খরচার সার—৩৭ ;

ফল-ফুল চাষে ও বংশবিস্তারে বীজ, কলম প্রভৃতি : ... ৩৮

ফল-ফুল চাষে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয় কলম—৩৯ কলম—৩৯ ; পৃথিবীর তথা ভারতের তথা পশ্চিমবঙ্গের বিখ্যাত ফল-ফুল এবং ঐ সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান—৪১ ।

গাছের রোগ নিবারণে ঔষধ ও প্রতিষ্ঠানের নাম : ... ৪৪

বইপত্রের জন্য : ৪৪

গ্লাডিওলাস ফুলের গেঁড়-এর জন্য : ৪৪

নিয়ন্ত্রিত সেচের জন্য : ৪৫

ব্যবসায়ের উপযোগী কয়েকটি ফল : ৪৫

আম—৪৫ ; ব্যবসায়ের জন্য কয়েকটি আম—৪৮ ।

পীচ্ ফল ৪৮

পীচ্ ফলের প্রজাতি বা প্রকারের পরিচয় ৪৮/৪৯ ; জায়গা নির্বাচন—৫০ ; পীচ্ গাছকে রক্ষাকরণ—৫০ ; কাজু বাদাম—৫১ ; সফেদা—৫৩ ; পেঁপে—৫৫ ।

পেয়ারা : ৫৭

আনারস : ৫৯

ফলসা—৬১ ; লিচু—৬১ ; সংক্ষেপে লিচুর চাষ—৬৪ ; স্ট্রবেরি—৬৫ ; পীচ্ ফলের ব্যবসায়ে নানান দিক—৬৫ ; পীচ্ ফলের অর্থনৈতিক দিক—৬৬ ।

বিষয় পৃষ্ঠা

ব্যবসায়ে উপযোগী কয়েকটি ফুল : ৬৬

রজনীগন্ধা—৬৬ ; পদ্ম—৬৯ ; গ্লাডিওলাস—৭১ ; গোলাপ—৭৪ ; ডালিয়া—৭৭ ; জবা—৮২ ; জবা গাছের রোগ-মড়ক—৮৪ ; বেল, জুঁই প্রভৃতি—৮৪ ; মোরগ ঝুঁটি ফুল—৮৫ ; গাঁদা—৮৬।

ফল-ফুল সংরক্ষণ : জ্যাম-জেলি-মালমালেড এবং ফল-ফুল সংক্রান্ত কয়েকটি বৃত্তি : ৮৭

সস্তায় ফল-ফুল সংরক্ষণ তথা গরিবের রেফ্রিজারেটর—৮৭ ; ফলের জন্য ফায়ার বোর্ডিং প্যাকিং বাক্স—৮৯ ; ফল-ফুলের সংরক্ষণ—৮৯ ; ফলের সংরক্ষণ—৯০ ; ফলের রস—৯১ ; স্কোয়াশ—৯১ ; সরবত—৯২ ; জ্যাম-জেলি-মারমালেড—৯৩ ; পেয়ারা-আম-আনারস প্রভৃতির জেলি—৯৩ ; মারমালেড—৯৬ ; মোরব্বা—৯৪ ; আমের আচার—৯৪ ; আমের চাটনি—৯৫ ; সিরক—৯৫ ; ফলের টফি—৯৬।

বেকারত্ব থেকে মুক্তির কিছু নতুন ভাবনা-চিন্তা ৯৭

বাড়ির সামনে লন তৈরি করা ... ১০০

বারান্দা সাজাবার গাছ ও তাদের পরিচয় ১০১

জবাফুল
গ্লাডিল
রজনীগ
সূর্যমুখী
পদ্মফুল

পিচফল
কলা

এক ॥ ● কেন ফুল চাষ করব ●

খবর জোগাড় করতে সারা পশ্চিমবাংলার প্রায় সব জায়গায় আমায় ঘুরতে হয়েছে। কেউ যদি প্রশ্ন করেন, কি ব্যাপারে? আমাকে বেশি ঘুরতে হয়েছে দুটি ব্যাপারে—পশুপালন ও কৃষিকার্যের ব্যাপারে। এরপরেও রয়েছে সরকারি খামারে প্রায় আট বছরের সব রকম অভিজ্ঞতা। সঙ্গে সঙ্গে আপনারা নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসু হবেন—আজকের এই বেকারত্বের যুগে অল্প পুঁজিতে কি উপায়ে ব্যবসায়ে সাফল্য আসতে পারে? আমার উত্তর হবে তখন—ফুল আর ফল চাষ। যদি আপনার নিজস্ব জমি থাকে বা অল্প পুঁজিতে জমি 'লিজ' নিতে পারেন।

একই ফল-ফুল আপনি হিন্দু-মুসলিম-জৈন-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান প্রায় সব ধর্মের লোকদের বাড়ি-মসজিদ-অফিস সব জায়গায় নির্বিবাদে ঢোকাতে পারেন। ফুল শাক-সব্‌জি-তরকারির বেলায় এটা অবশ্যই সম্ভব। কিন্তু আমিষ? মাছ-মাংস-ডিমের বেলায়? নৈব নৈব চ। রাশভারি নির্লোভ এক উঁচু পদের মানুষ এককালে আমার প্রচুর উপকার করেছিলেন। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, ভদ্রলোক ঘুষ নেন না। আমার কৃতজ্ঞতাবোধ আমায় রেহাই দেয় না কিছুতেই, আমি তাঁকে ঘুষ দিয়েছিলাম, অবশ্যই আপনি যদি ঐ নোংরা কথাটা উল্লেখ করতে চান। হ্যাঁ, আমি ওঁকে এক গুচ্ছ গ্ল্যাডিওলাস্ ফুল দিয়েছিলাম এবং তিনি তা সাদরে গ্রহণও করেছিলেন। ফল-ফুল চাষের বিস্তর সুবিধার মধ্যে প্রথম সুবিধাটা হলো এই স্নিগ্ধতার আমেজ এবং একটা শুভ্রভাব। কিন্তু আপনি প্রাণীজ আমিষ (মাছ-ডিম-মাংস), এমনকি তরকারির বেলায় তা' পাবেন না।

॥ ফল-ফুল চাষের সুবিধা ॥

১. ফল-ফুল চাষের মধ্যে সুবিধাগুলি ফুলই বেশি টানে। একমাত্র ব্যবসায়ভিত্তিক পেঁপে চাষে বছর খানেকের মধ্যে ফসল বিক্রি করে ঘরে টাকা তুলতে পারছেন।

২. ফুলচাষে ৬০ দিনের মধ্যে আপনি ফুল বিক্রি করে ঘরে টাকা তুলতে পারবেন। গ্লাডিওলাস এই ফুলের একটা উদাহরণ।

৩. আপনার যা জমি আছে তাই নিয়ে আপনি ফল-ফুল চাষে নেমে পড়তে পারেন। অনেকে পুরো ফল-ফুলও তৈরি করেন না। শুধুমাত্র চারা

কলম-কাটিং বিক্রি করে খুব তাড়াতাড়ি লাভের টাকা ঘরে আনেন। ব্যবসায়ের এটাও প্রধান সূত্র বটে—আপনার টাকাটা কোনো এক জায়গায় না আটকিয়ে সবসময়ে ঘুরবে, আর ঘোরার তালে তালে আপনাকে এনে দেবে মুনাফা।

৪. পুকুর থেকে মাছ চুরি, মাঠ থেকে ধান চুরি, বাগিচা থেকে ফল চুরি হলেও একমাত্র সরস্বতী পূজা ছাড়া বাগান থেকে ব্যাপক ফুল চুরি হয় না। যদি হয়, কানে কানে বলছি—তাহলে আপনার পাশের বাগানের ফুল চাষি-ভাই-ই ঐ অপকর্মটি করেছেন হঠাৎ তার একটা বড় অর্ডার এসে যাওয়াতে। হ্যাঁ, এটা ফুল চাষি ভাইরাই হাসাহাসি করে বলেন।

৫. পশ্চিমবাংলার বেশ কয়েকটি রেলস্টেশনের কিছু বেকারদের আমি জানি, যাঁরা খুব জোর পাঁচ ঘণ্টার জন্য সুদে টাকা ধার নিয়ে কলকাতার মেছুয়াবাজার থেকে ফল কিনে ফল বিক্রি করে গাঁটে লাভ পুরে সুদখোরকে টাকা ফেরৎ দেন সুদ সমেত, নিশ্চয়ই ঐ সব কাজটাই পাঁচ ঘণ্টার মধ্যেই হচ্ছে।

৬. ১৯৬৬ সালের আগে পর্যন্ত পশ্চিমবাংলার ফুল নিয়ে বিশেষ মাতা-মাতি হয়নি। জওহরলাল নেহরুর সবসময় চাপকানে লাল গোলাপ এঁটে অজান্তে ফুলের বিজ্ঞাপন বয়ে নিয়ে বেড়িয়েও ফুলের খুব একটা সুবিধা হয়নি। তারপরই হঠাৎ যেন 'রটে গেল ক্রমে'—ফুল মানুষের মন জয় করে ফেললে। সব ব্যাপারেই ফুল। ফুল নিয়ে নাম-ধাম-অলংকার-সিনেমা (রজনীগন্ধা, রেড্ রোজ) পর্যন্ত। কারণও অবশ্য অনেক। ১৯৬৬ সালের পর গরিব আরও গরিব হয়েছে (যেমন, বড়লোক হয়েছে আরও বিত্তবান)। কিছু বড়লোক তাদের ফালতু টাকা খরচের একটা উৎস পেয়েছে। ফল-ফুলের মধ্যে। আবার অশিক্ষিত যখন হঠাৎ বড়লোক হয়ে যায় তখন সে রাতারাতি রুচিবান হয়ে পড়ে এবং তখন তার রুচি খেলে যায় ফল-ফুলের মধ্যে। টেবিলে-ফুলদানিতে ফুল, ঝুড়িতে ফলের পাহাড়। একমাত্র শিক্ষাই রুচিকে ঠিকমত গড়ে বলে গরিব যখন তার ভালোবাসার ধনকে কিছুই দিতে পারে না,—তখন দেয় রজনীগন্ধার ছোট একটি গুচ্ছ।

৭. ফল-ফুলের চাহিদা আজকাল অসম্ভব বেড়ে গেছে। পথে-ঘাটে বিশেষ করে ট্রেনে এমন সব ফল পাওয়া যাচ্ছে,—যেগুলি পেতে ২০ বছর আগে আপনাকে দশ-মাইল দূরের বাজারে যেতে হোত। বেদানা, ন্যাসপাতি এর উদাহরণ।

৮. ফুলের চাহিদা আজ অসম্ভব। তাই আপনি দেখতে পাবেন,—স্থানে-অস্থানে, অফিসে-কলকারখানায় ফুল-অর্কিড-ক্যাকটাসের সমারোহ। সকলেই তার অফিস-দোকান-কারখানা ফুল-অর্কিড্-ক্যাকটাস দিয়ে সাজিয়েছে।

৯. ফল-ফুল চাষে বিশেষ করে ফুল চাষে জমি কম লাগে বলে আপনি যে কোনও একখণ্ড জমি ব্যবসায়ের উপযোগী করে সাজিয়ে নিতে পারেন। খাঁচায় মুরগি পোষা থেকে কম খরচায় আপনি পুরোপুরি ব্যবসায় ভিত্তিতে যত্রতত্র টবে ফুল চাষ করতে পারেন—বারান্দায়, ছাদে, কার্নিসে।

১০. হঠাৎ মড়কে জীবজন্তু লোপাট হয়ে যেতে পারে শত যত্ন বা নিরাপত্তা নেওয়া সত্ত্বেও। কিন্তু গাছে ফল-ফুল ধরলে সে সম্ভাবনা খুবই কম।

১১. এক-দু বছর বাঁচে এমন ফল-ফুল চাষে আপনি যতরকম প্রজাতি বা ভ্যারাইটি তৈরি করতে পারেন—জীবজন্তুর বেলায় সেটা সম্ভব নয়। মুরগি বাঁচে পাঁচ বছর। সুতরাং তার প্রজাতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে আপনার অনেক সময় লাগবে। গোলাপ-গাঁদা-গ্ল্যাডিওলাসদের বেলায় সময় লাগবে অনেক কম। তাই বছর বছর নতুন নতুন প্রকার বা প্রজাতি যোগ হচ্ছে ফল-ফুলের তালিকায়।

॥ ধান-আখ-রজনীগন্ধা-গোলাপ ও গ্লাডিওলাসের তুলনামূলক চাষ ও লাভ ॥

(ক) বিঘে:প্রতি ধান চাষের হিসেব

লাঙ্গল ৪টি, প্রতিটি লাঙ্গল ২০ টাকা হিসেবে	টা. ৮০.০০
বীজ	১০০.০০
বীজ লাগানোর খরচ	১০০.০০
সার (নাইট্রোজেন, ফসফোরাস্ ও পটাশ)	২৮০.০০
ওষুধ	১০০.০০
জল	৩০০.০০
ধান ঝাড়াই	১৪০.০০
	টা. ১১০০.০০

ঐ চাষে মোট ধান পাওয়া যায় ২০ (কুড়ি) মণ

প্রতি মণ ৬০·০০ টাকা হিসেবে ২০ মণের দাম	টা. ১২০০·০০
বিচুলি	২০০·০০
	টা. ১৪০০·০০

মোট লাভ টা. ১৪০০ – টা. ১১০০·০০ = টা. ৩০০·০০ টাকা

(খ) বিঘে প্রতি আখ চাষের হিসেব

আখের বীজ	টা. ১০০·০০
দশজন লোক দিয়ে বীজ লাগানোর খরচ (লোক পিছু ১৫ টাকা ধরে)	১৫০·০০
সেচ : প্রতি সেচের খরচ ৮০ টাকা ধরে ৫টি সেচের খরচ	৪০০·০০
সার : নাইট্রোজেন ৭০ কেজি	১১২·০০
পটাশ ৬০ „	৫৬·০০
ফসফোরাস্ ১৪৫ „	১১২·০০
ওষুধ	১০০·০০
মাটি কোপান	১৫০·০০
বিবিধ খরচ	৩০০·০০
	টা. ১৪৮০·০০

॥ আখ বিক্রি ॥

প্রতি কাঠা ১০০ টাকা ধরে, ১০০ × ২০	টা. ২০০০·০০
খরচ	টা. ১৪৮০·০০
	লাভ→টা. ৫২০·০০

॥ সাথী ফসল : সরিষা ॥

লাঙ্গল ৫টি, প্রতিটি লাঙ্গল ২০ টাকা ধরে	১০০·০০
বীজ এক কেজি	৫·০০
ওষুধ	৫০·০০
সরষে ঝাড়াই	১০০·০০
বিবিধ	৪৫·০০
	টা. ৩০০·০০

ফসল : তিন মণ সরিষা

প্রতিমণ টাঃ ১৬০ টাকা ধরে, তিন মণের দাম—	টা. ৪৮০·০০
তিন মন সরিষার জন্য খরচ—টাঃ ৩০০·০০	৩০০·০০
মোট লাভ	টা. ১৮০·০০

এককালিন এক বিঘে জমিতে আখ চাষ করে আখ এবং সরিষার জন্য চরম লাভ হবে,—৫২০ টা.+১০০টা.=টা. ৭০০·০০।

দ্রষ্টব্য : যাবতীয় খরচ এবং জিনিস পত্রের দাম আজকে ২০-১২-৮৫ তারিখ অনুসারে।

গম-পাট প্রভৃতি চাষে লাভ একইভাবে বের করে তুলনা করা উচিৎ।

॥ ৮ কাঠা জমিতে রজনীগন্ধা ফুলের চাষ ॥

তিনটি লাঙ্গল, প্রতিটি লাঙ্গল টাঃ ২০·০০ হিসেবে	টা. ৬০·০০
কন্দ বা গেঁড় বা বীজ—এক কুইণ্ট্যাল	২৫০·০০
গেঁড় লাগানোর খরচ	
দশজন লোক, লোকপিছু টাঃ ১০·০০ ধরে,	১০০·০০
সার (বছরে তিনবার)	৭৫০·০০
ওষুধ	১০০·০০
সেচ (সাত দিন অন্তর), মোট খরচ	৫০০·০০
নিড়ানি (১৫ দিন অন্তর), মোট ৯৬টি	৯৬০·০০
বিবিধ	১০০·০০
মোট	টা. ২৮২০·০০

॥ আলোচনা ॥

আট কাঠা জমির রজনীগন্ধা যেভাবেই হোক বিক্রি করে কমপক্ষে মোট ৩০০০ টাকা পাওয়া যায়।

সুতরাং মোট লাভ দাঁড়াবে টা. ৩০০০·০০ – টা. ২৮২০·০০ = টা. ১৮০·০০

এই লাভ শুধু মাত্র ফুল বিক্রি করে। লাভটা বেশি দাঁড়াবে যদি এই ফুল গাড়ি-খাট-চেয়ার সাজাতে বা বৌভাতে কনের গহনায় ব্যবহার করেন অথবা তিন বছর পরে ফুল তুলে দেবার সময় গেঁড় বিক্রি করে আপনি প্রচুর লাভ করতে পারেন।

॥ ৬ কাঠা জমিতে গ্লাডিওলাস্ ফুল চাষ ॥

কন্দ ১০,০০০—প্রতিটি কন্দের মূল্য টা. ৪·০০ হিসেবে,—টা.	৪০,০০০·০০
দশজন লোক, লোকপিছু খরচ টা. ১০·০০ ধরে,	১০০·০০
সার	২০০·০০
ওষুধ	১০০·০০
সেচ	১০০·০০
নিড়ানি	১০০·০০
বিবিধ	৫০০·০০
মোট খরচ টা.	৪১,১০০·০০
ফুল বিক্রি করে পাওয়া যাবে,—	৩০০০·০০
কন্দ উৎপন্ন হবে, ২০,০০০টি, প্রতিটি টা. ৪·০০ ধরে,	৮০,০০০·০০
মোট আয় টা.	৮৩০০০·০০

মোট লাভ টা. ৮৩,০০০ – ৪১,১০০ = টা. ৪১৯০০·০০

॥ ৬ কাঠা জমিতে গোলাপ চাষ ॥

লাঙ্গল ৩টি, প্রতিটি টা. ২০·০০ হিসেবে,	টা. ৬০·০০
গোলাপ চারা (৩০০টি, চারা প্রতিটি টা. ৩·০০ ধরে)	৯০০·০০
চারা লাগানোর খরচ :	
কুড়িটি জন, জন প্রতি টা. ১০·০০ ধরে,	২০০·০০
সার (গোবর, নিম খোল, হাড়ের গুড়ো, সরিষা খোল)	৪৫০·০০
ওষুধ	৫০·০০
সেচ—(দশ দিন অন্তর)	৪০০·০০
খরচ টা.	২০৬০·০০
কলম খরচ	৪০০০·০০
মোট খরচ টা.	৬০৬০·০০

মোট কলম—৫০০০টি
নষ্ট কলম—১০০০টি

মোট কলম যা পাওয়া যাবে—৪০০০টি

প্রতিটি কলমের দাম টাঃ ২·৫০ ধরে, ৪০০০ × ২·৫০ = টা. ১০,০০০·০০

মোট লাভ = টা. (১০,০০০ – ৬০৬০) = টা. ৩৯৪০·০০

দ্রষ্টব্য : ব্যবসায়ে ফলের লাভ বিভিন্ন ফলের বর্ণনার সময় দেওয়া হবে। যাবতীয় খরচ-খরচা ২০।১২।৮৫ সালের হিসেব অনুসারে।

● ফুল চাষের নানাদিক ●

॥ ফল-ফুলের সবচেয়ে বেশি ব্যবহার পূজায় ॥

ফুল এখনও সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয় পূজায়। ফলেরও গতি তাই ছিল একসময়। ক'জন গরিব আর তার অসুস্থ ছেলেমেয়েদের ফল খাওয়াতে পারত? কিন্তু আজ পরিবার নিয়ন্ত্রণের কল্যাণে এবং ফলফুলের চাষ অসম্ভব বেড়ে যাওয়ায় ফল আর দুষ্প্রাপ্য নয়। রেডিও, টি. ভি.-তে পুষ্টির ব্যাপারে সরকার সোচ্চার হওয়ার জন্য আমরা কথায় কথায় যা খেতে পারিনি আজকের বাপ-মাদের নীলমণি একটি-দুটি বাচ্চার মুখে অনায়াসে তা তুলে দিতে পারছেন।

কিছু কিছু ফুল যেমন, গোলাপ, গ্ল্যাডিওলাস, পিটুনিয়া, মাসুন্দা, চন্দ্রমল্লিকা ডালিয়া পূজার নৈবেদ্যে না পৌছালেও সব দেশী ফুলই দেব-দেবতার চরণে পৌছাচ্ছে। অজান্তে বেশ কিছু বিদেশী ফুল আমরা দেব আরাধনায় লাগিয়ে দিচ্ছি। যেমন, রজনীগন্ধা, গাঁদা। আবার সারা বছর যাদের খোঁজও রাখি না বিশেষ পূজায় তাদের জন্য অসম্ভব পয়সা খরচ করতেও আমরা পিছু-পা হইনা। কালী ও সরস্বতী পূজায় জবা এবং পলাশ বোধহয় এর সবচেয়ে সুন্দর উদাহরণ। খোদ কলকাতা শহরে দশ বছর আগে বৃহস্পতিবার শুধু কলাপাতার প্যাকেটে ফুল দুর্বা বেলপাতা আমের সরা বিক্রি হতে দেখেছি। এখন তা হচ্ছে রোজ। শুধু তাই নয়, কলকাতাকে কেন্দ্র করে দশ মাইল ব্যাসার্ধে সব শহরতলি এলাকাগুলিতে এই একই ব্যাপার হচ্ছে। হবেই বা না কেন? কলকাতার আশপাশ এলাকায় পড়ে থাকা জমিতে আজকাল কে আর ফুলবাগান ফেলে রাখে? তাই পাশের বাড়ির বাগান বা ফেলে রাখা জমিখণ্ডের আপনা থেকে গজিয়ে ওঠা লঙ্কা-জবা-টগর সে পাচ্ছে না। কিনতে হচ্ছে তাকে সেই দোকান থেকে। সুবিধাও অনেক, নামমাত্র পয়সার জন্য হন্যে হয়ে তাকে আর এখান থেকে ফুল, ওখান থেকে আমের সরা, নর্দমার পাশ থেকে দুর্বাঘাস তুলতে হচ্ছে না।

সুতরাং বেকার ভায়েরা মাত্র কয়েকটাকার পুঁজিতে সকালের কয়েক ঘণ্টার ব্যবসায়ে অনায়াসে নামতে পারেন।

॥ আপনার বাড়ি সাজাতে ॥

শেষ বয়সে বাড়ি করেছেন জীবনের সব সঞ্চয় কুড়িয়ে-কাচিয়ে। বাড়ির লাগোয়া কিছু জমি পড়ে রয়েছে—কোন কাজে লাগছে না কারণ চাষের ব্যাপারে

আপনি একেবারে অনভিজ্ঞ বা একেবারে সময় নেই। ফুল চাষ সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞ অনায়াসে সে আপনার জমিটা আপনার সামর্থ্য অনুসারে সাজিয়ে দিতে পারে। খরচ হয়ত পড়বে ২৫০ থেকে ৫০০ টাকা। শুধু তাই নয়, বাগান করলেই তো হলো না। বাগানটার যত্নও তো করতে হবে। ঐ বেকার ভাই-ই তা করে দেবে। তবে বার্ষিক বা মাসিক কিছু টাকার হাত-বদলে বেকার ভাইয়ের এই রোজগারই বেড়ে যাবে কয়েকগুণ যদি জমির পরিমাণ ছয় কাঠা থেকে বিঘের কাছাকাছি হয়। ফুল চাষে অভিজ্ঞ বেকার ভাইদের আমি অনুরোধ করবো ব্যাপারটা তলিয়ে দেখতে।

॥ অফিস সাজাতে ॥

কলকাতার এক বিখ্যাত রুচিবান শিক্ষিত প্রকাশকের অফিসে অনেক ঘর বারান্দা করিডর ও প্যাসেজ। এই বইটা লেখবার আগে কথা প্রসঙ্গে তাঁকে একদিন বলেছিলাম—আপনার অফিসে তো ফুলের নাম গন্ধ নেই। অফিসটা ফুলের টব, ফুলদানি, কিছু অর্কিড ঝুলিয়ে সাজিয়ে নিচ্ছেন না কেন? সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর উত্তর—দিন্ না অভিজ্ঞ কোনো ফুলচাষি ভাইকে অফিসটা সাজিয়ে দিতে। অবশ্য সাজিয়ে দিলেই হলো না—তাকে এর যত্নের ভারও নিতে হবে—অবশ্যই উপযুক্ত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে।

আমরা জানি যেহেতু রাস্তাঘাটে বিজ্ঞাপন দেখি "ইন্টিরিয়র ডেকোরেশন" অর্থাৎ বাড়ি অফিস কারখানার শিল্পসুলভ্ গৃহসজ্জা। বড় অফিসে নিশ্চয়ই আপনি পাত্তা পাবেন না, কারণ আপনার মূলধন অল্প। কিন্তু এই অল্প মূলধনেই আপনি ছোটখাট কারখানা অনায়াসেই সাজাতে পারেন। আর কাজটাও হবে অনেক বছরের। যেহেতু মালিক আপনাকে দিয়ে বাগান করেই খালাস হবে না। বাগান যথাযথ রক্ষা করতে হবে।

আমি অনেক বড় দোকানে মালিকের খুপরি ঘরে অর্কিড ঝুলতে দেখেছি। গাছের এই একটা সুবিধা,—কিছু-না কিছু গাছ আপনি পাবেন যেগুলি অন্ধকারেও জন্মায়।

॥ ফুলের গহনা-গাড়ি-খাট-চেয়ার বা সিংহাসন সাজাতে ॥

২০ বছর আগের বিয়েতে কনেকে সাজাতে, ছাদনাতলার আসরে আর ফুলশয্যায় কত আর ফুল ব্যবহার করা হতো? নামে ফুলশয্যা অথচ ফুলের সংখ্যা তখন হাতে গোণা যেত। আজ যে মুহূর্তে বর বিয়ের জন্য বের

হলো সেই মুহূর্তে বৌয়ের আগে ফুলের সঙ্গে তার গাঁটছড়া বেঁধে গেল। মোটর গাড়ির আগা পাস্তলা ফুলে মোড়া। বাহারই বা তার কত। ময়ূর-পঙ্খী নকশা, ফুলের শুভ্রতা গাড়ির রঙ-কে ঢেকে দেয়। তারপরেই কনের বাড়ি—ফুল, ফুল আর ফুল। গাড়ি সাজাতে ফুলের ব্যবহার আজ বিয়ের সঙ্গে যেন অচ্ছেদ্য হয়ে গেছে। মওকা বুঝে ফুলচাষি ভাই আয়ও করেন যথেষ্ট। কলকাতায় গাড়ি সাজাতে লাগে ৫০০ টাকার ওপরে, গ্রামে সেটা ঠেক্ খায় ২০০ টাকায়। সব রকম ফুলই তখন 'অগত্যা মধুসূদন' বলে কাজে লাগানো হয়। অপাংক্তেয় মোরগ ঝুঁটি ফুল তখন সুন্দরভাবে গোলাপের জায়গা দখল করে নেয়। অন্য সময় যখন রজনীগন্ধা বিকোয় ৩-৫ টাকায় কেজি, বিয়ের মরশুমে তারই দাম হবে ৪০ টাকার ওপরে। অথচ বিয়ের গাড়ি সাজাতে খরচা খুব বেশি হয় না, লাভটা যেখানে প্রচুর। যে কোন বেকার ভাই কাজটা মাত্র কয়েকদিনের শিক্ষানবীশে শিখে নিতে পারেন।

একই ঘটনা সত্য হয়ে দেখা দেয় বিয়ের ফুলের গয়নাগুলির ব্যাপারে। নরম তার যদি পাওয়া যায় গহনা বানানোও তখন সহজ। আর তারের গহনা টেকসই যেমন হয়, ইচ্ছেমতো তাকে নামানো বাঁকানোও যায়। গহনা বলতে এখানে সোনার যত গহনা আছে কনেকে সাজাবার তারই রূপান্তর ঘটে ফুলের মারফৎ। ফুলে সাজানো চেয়ারকে (অর্থাৎ যেখানে বসে বৌ সকলকে প্রথম দর্শন দেন) সিংহাসন বলে। খাট-সাজানো বা বর-বৌয়ের ঘরকে যে কায়দায় সচরাচর সাজানো হয় তাকে ঠিক জাপানি মতে পুষ্পসজ্জা বলা চলে না। তবে ভরসা আছে অদূর ভবিষতে আমাদের দেশেও রীতিমত পুষ্পসজ্জার চল হবে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের পর।

॥ বনসাই, ফুল থেকে ওষুধপত্র প্রভৃতি ॥

অনেক জায়গায় টবে ছোট পাকুড়-বট-ডালিম-ঝাউগাছ দেখে আমরা অবাক হয়ে যাই। অত বড় গাছটা কি করে টবে এল? এ কি সম্ভব? কিছুমাত্র অসম্ভব নয়। এর পেছনকার শিক্ষা, নিজের হাতে কাজ করার কিছু অভিজ্ঞতা থাকলে এটা আপনিও পারেন। শৌখিন লোকেরা আজও বড় গাছের 'মিনি' আকার বা বনসাই প্রচুর টাকা-পয়সা দিয়ে কিনে থাকেন।

জলবায়ুর জন্য ব্যাঙ্গালোর চিরকালই ফল-ফুল চাষের মক্কা-মদিনা। ফুলের চাষের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সেখানে এসেছে ফুলজাত বিভিন্ন ব্যবসা। সেণ্ট বা এসেন্স তারই মধ্যে একটি। পশ্চিমবাংলায় এমন কোনো প্রতিষ্ঠান আমার

জানা নেই যাঁরা ফুল থেকে কোন নির্যাস তৈরি করেন। তবে স্বীকার করবো, এর ব্যবসায়িক সম্ভাবনা প্রচুর আছে।

॥ **ফল-ফুল বিদেশে রপ্তানি** ॥

বিদেশের বাজারে ভারতীয় তথা পশ্চিমবাংলার ফল-ফুল—বিশেষ করে গোলাপের এবং আমের চাহিদা আজ আর নতুন নয়। ২৪-পরগনার শ্যামনগর রেল স্টেশনের লাগোয়া নার্শারি স্টোর্সের মালিক শ্রীদেবাশিস ঘোষ জানালেন,—'ওয়াশিংটনে এয়ার ইণ্ডিয়ার একটি কনফারেন্সে ল্যাংড়া আম পাঠিয়ে যথেষ্ট সুখ্যাতি পেয়েছি।' শ্রীঘোষের এই সুখ্যাতি পাওয়া হঠাৎ কিছু নয়। ভারতের ল্যাংড়া-বোম্বাই-হিমসাগর-মল্লিকা-নীলম-আলফানসো বিদেশের নামকরা শহুরে মানুষের মন কেড়ে নিয়েছে। আবু ডুবাই এবং পেট্রল বিক্রি করে বড়লোক দেশগুলিতে ভারতের আঙ্গুর, কমলালেবু, আপেল প্রভৃতির প্রচুর চাহিদা। বিদেশের বাজারে আরও যেসব ফলের চাহিদা তৈরি করা যায় সেগুলি হল, ফলসা-সবেদা-জামরুল-গোলাপজাম। বাইরে বেশী কিছু না হলেও শিলিগুড়ি আগরতলা অঞ্চলে আনারসের প্রচুর চাষ হচ্ছে। ওজনে ৩-৪ কেজি এবং দেখতে সুন্দর। বিদেশের বাজারে মন কেড়ে নেবার সম্ভাবনা আছে এর। আগে গ্রামের স্টেশনারি দোকানে কাজুবাদাম পাওয়া যেত, আজ আর পাওয়া যায় না। গেল কোথায়? অধিকাংশ বিদেশে, বাদবাকি বড়লোকের চায়ের টেবিলে। দামও হাতে ছ্যাঁকা লাগা মতো—প্রতি কেজি ১২০ টাকা।

গোলাপ বিদেশে বাজার করছে অনেকদিন হলো। কারণ হরেক রকমের গোলাপ এদেশে চাষ হচ্ছে। প্রজাতির সংখ্যা ৩৫০-এর ওপর। তাই এর চাহিদা বাড়াটা আশ্চর্যের কিছু নয়। গোলাপের মত সম্ভাবনাময় ফুলগুলি হল,—গ্লাডিওলাস, পিটুনিয়া, ডালিয়া, চন্দ্রমল্লিকা প্রভৃতি। বিদেশের বাজারে ফলফুল পাঠালেই তো হবে না। সেগুলি অবশ্যই হবে মানুষের পাতে দেওয়ার মত। আমাদের দেশে এখন চমৎকার চমৎকার ডালিয়া-চন্দ্রমল্লিকা-গ্লাডিওলাস হচ্ছে,—যেগুলি বিদেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারে।

বিদেশে ডালিয়া-চন্দ্রমল্লিকা-গ্লাডিওলাস-রজনীগন্ধা বা অন্য যে কোন নয়ন-মুগ্ধকর ফুলেরই বাজার হবে যদি সেগুলি শক্ত হয় এবং বড় ডাঁটি থাকে। বিদেশে বিশেষ করে খ্রীষ্টান দেশগুলিতে ফুল রপ্তানির মস্তবড় একটা সুবিধা হলো ওদের প্রধান উৎসবের সময়গুলিতেই চারদিক থাকে বরফে ঢাকা,

যেমন, গ্রীঃ গ্রীমাস, পয়লা জানুয়ারি। উঁচুমানের শক্ত ফুল হলেই তখন বিদেশের বাজার চলবে। শুধু ফুলই নয়, একই সম্ভাবনা রয়েছে বীজ-কাটিং-কলমের এবং চারা গাছের বেলায়।

পশ্চিমবাংলার বেলায় ঐ সব ফল-ফুল রপ্তানির কিছু ঠিকে অসুবিধাও আছে। ফল-ফুলের প্লান্ট-কোয়ারিনটিন সার্টিফিকেট চাই। প্লেনে জায়গা দরকার। আবার দমদম থেকে বিদেশে সরাসরি প্লেনে চলাচল বন্ধ হয়ে গেল ১৯৮৬ সালের ১২ই নভেম্বর থেকে। পথে কোথাও আটকালে আপনার ফুলের ও ফলের সাড়ে-সব্বোনাশ কারণ এদের জীবন মেরেকেটে পাঁচ থেকে সাত দিন।

পশ্চিমবঙ্গ এমন একটি প্রদেশ যেখানে পৃথিবীর মোটামুটি সবরকম মাটি এবং জলবায়ু পাবেন। সমুদ্র যেমন এ-প্রদেশে পাবেন ঠিক তেমনি পাবেন আকাশছোঁয়া পাহাড়। শীতের দেশের ফল-ফুল চাষ এখানে অসম্ভব নয়। অনাদিকাল থেকে দারজিলিং-এ চা-কমলালেবু হচ্ছে অথচ আপেল হয় না। প্রচুর আপেল হয় সিকিমে। প্রচুর পরিমাণে বাইরে রপ্তানিও হয়। নতুন করে যদি আপেল চাষ সম্ভব না হয় তাহলে পিচ্ ফল-চাষে অসুবিধা কি? হিমাচল প্রদেশে পিচ্ ফল চাষ করে প্রদেশটি বেশ রম্-রমা হয়েছে। আমরাও তো হিমালয়ের কোল ঘেঁষে পিচ্ ফল চাষ করতে পারি। বিদেশে রপ্তানি করতে পারি সুন্দর ফলটা।

পশ্চিমবাংলা আবহমান কাল থেকে পেয়ারা-পেঁপের চাষ করে আসছে। পুসা-প্রজাতির একটি পেঁপে মাটি থেকে মাত্র ফুট খানেক উঁচুতে হয়। জায়গা লাগে কম। অন্য ফসলের চাষ যেখানে করি সেখানে মওকা বুঝে বামন-প্রজাতির পেঁপে লাগাতে পারি। লিচু আম বাগানের ছায়াবহুল অঞ্চলে অনায়াসে আবাদ করে জমির যথাযথ ব্যবহারে উৎসাহী হতে পারি। পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে কাশীর পেয়ায়া নামে পরিচিত পেয়ারাগুলির মনমাতানো রং এবং যদি ফলগুলিকে বিচিহীন করা যায়, তবে চাহিদা বিদেশের বাজারে প্রচুর হবে। গোলাপজামে সুন্দর একটা গন্ধ আছে। খেতেও ভাল। ভাল-ভাবে চাষ করে এবং বিদেশে রপ্তানি করে আমরা অনায়াসে বৈদেশিক মুদ্রা ঘরে তুলতে পারি।

রজনীগন্ধা বা ফুল চাষের জমিতে ফুল চাষ আরম্ভ করার সময় যদি শাল-সেগুন-জালানি কাঠের চারা লাগাই তবে ফুলের ঝাড় তুলে দেবার সময় দেখা

যাবে ঐ সব আসবাবপত্র আর জালানির গাছ অনেক বড় হয়ে গেছে। আশার কথা, কয়েক বছরের মধ্যেই ঐ গাছগুলি বেশ কিছু পয়সা দেবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বনবিভাগ দপ্তর সম্পূর্ণ বিনামূল্যে জেলায় জেলায় দামি দামি গাছের চারা দিয়ে থাকেন।

॥ বিদেশে ফল-ফুলের আমদানি-রপ্তানি ॥

ভারতীয় আই. টি. সি. সংস্থা একটি সমীক্ষা চালিয়ে দেখেছে ভারত থেকে বিদেশে ফল-ফুল রপ্তানি বেশ বেড়ে গেছে। ১৯৭০ সাল থেকে ব্যাপারটা ঘটেছে। আম এভোকেভো এবং আনারসের বেলায় রপ্তানির পরিমাণ অসম্ভব বেড়ে দাঁড়াচ্ছে যথাক্রমে ১৬৪%, ৮৭% এবং ৪৪%—১৯৭৫-৭৯ সালে। এসপারগাস্ এবং স্ট্রবেরির (জামের) শতকরা ভাগ বেড়ে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৪৩% এবং ৩৭%। ওপরের ফলগুলি কিনেছেন ফরাসিদেশ, ইংল্যাণ্ড, নেদারল্যাণ্ড্, বেলজিয়াম্, সুইডেন এবং সুইজারল্যাণ্ড। গরিব তথা উন্নতশীল দেশগুলির অনেকেরই তো বিদেশে রপ্তানিযোগ্য ফল-ফুল আছে। তাই বিদেশে রপ্তানির ব্যাপারে ভারতকে লড়তে হচ্ছে কিউবা, সিপরাস্, মিশর, ইথিওপিয়া, আইভরি কোস্ট, কেনিয়া, মালি, মেক্সিকো, মরোক্কো, নাইজেরিয়া, সেনেগাল, আপার ভল্টা এবং ক্যামেরুনের সঙ্গে।

ফুলের ব্যাপারে বিদেশের টাকা ঘরে আনতে হলে ভারতকে অবশ্যই এখুনি হল্যাণ্ড ও জার্মানির সঙ্গে কোনো কারিগরি চুক্তিতে আসতে হবে। মনে রাখতে হবে, হল্যাণ্ড পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি ফুল বিক্রি করে আর জার্মানি কেনে সবচেয়ে বেশি ফুল। চুক্তিতে এলে ভারত এই দুই দেশের পরামর্শ মত ফুল তৈরি করতে পারবে।

এয়ার ইণ্ডিয়া বিদেশে ফুল পাঠাবার জন্য সহযোগিতার হাতও বাড়িয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি কম খরচে ভারত থেকে ফুল ও ফল বিদেশে পাঠাতে রাজি। ফলের ব্যাপারেও এয়ার ইণ্ডিয়া একই সুবিধা দেবে।

বাইরে ফল-ফুল পাঠাবার ব্যাপারে আপনি খোঁজখবর পাবেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি বিভাগের বিপণন শাখায় (রাইটার্স বিল্ডিং) এবং কেন্দ্রীয় গণেশ এভ্যুনিউর এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট দপ্তরে।

।। ফলকে পচতে না দিয়ে সংরক্ষণ করা ।।

ফুল খাবার জিনিস নয়, পূজার বা মনতুষ্টির জন্য সে পচে গেলে তার কোন মূল্যই নেই। ফলের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অন্য রকম। ফল মানুষ খায় পচতে না দিয়ে ও বিভিন্ন উপায়ে তাকে সংরক্ষণ করে। সেই উপায়গুলি হলো,—চাটনি, সুঁটকি, জাম, জেলি, মারমালেড, স্কোয়াস্ এবং বিভিন্ন নির্যাস তৈরি করে। ফলের ঐ বিভিন্ন খাবারগুলি তৈরি করা এমন কিছু শক্ত কাজ নয়। প্রচুর বই আছে ঐ সব ব্যাপারে, যাতে ধাপে ধাপে কিভাবে তৈরি করতে হয় সেটা দেখিয়ে দেয়। মূলধন লাগে অল্প। ভাল জিনিস অর্থাৎ সৎ হলে বিকোবেও ভাল।

।। চাষবাস ।।

কথায় বলে চাষবাস। অর্থাৎ আপনি যেখানে চাষ করবেন, বাস করবেন ঠিক তার পাশে। তাতে সুবিধা অনেক। নিজের সম্পূর্ণ আওতায় পুরো চাষটাই থাকছে আপনার নজরে। কর্মচারি চারা-ফুল-বীজ খুব একটা সরাতে পারবে না। ঝামেলাটা অবশ্য অন্য দিক দিয়ে। ডালিয়া-চন্দ্রমল্লিকা প্রভৃতি শৌখিন আর পুষ্পসজ্জার হাজার রকমের প্রজাতি যখন মালিভাই চিনতে শিখে যায়—তখনই সে কাজ ছেড়ে দেয় অন্য ঘাটে ভিড়তে। দক্ষ মানুষ, খুঁজে বার করা চট্ করে সম্ভব হয় না। সুতরাং ফল-ফুল চাষে চারা চিনবার কাজটা নিজের হাতে বা একান্ত বিশ্বাসী মানুষের হাতে রাখবেন।

মনে রাখবেন ফল-ফুলের ব্যবসায় চিরকালই সবচেয়ে বেশি লাভ হয় চারা-কাটিং বা কলম বিক্রি করে। এদের মধ্যে আবার চারায় লাভ সবচেয়ে বেশী।

।। ট্রেনিং শিক্ষা প্রভৃতি ।।

আপনার চাষের ব্যাপারে শত অভিজ্ঞতা থাকলেও উন্নত ধরনের ফল-ফুল চাষের জন্য বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন। চাষটা আপনি নিজের জন্য করছেন না। করছেন বিক্রির জন্য। লোকে ভাল জিনিসটাই নেবে। আপনাকে প্রতি-যোগিতার সম্মুখীন হতে হবে। তাই যথাযথ শিক্ষার জন্য আপনাকে যোগা-যোগ করতে হবে, (১) বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, পোঃ মোহনপুর, জেলা নদীয়া। আপনি আরও খোঁজ নিতে পারেন, (২) দি এগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটি অব্ ইণ্ডিয়া, ১নং আলিপুর রোড কলকাতা, (৩) হর্টিকালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট, কৃষ্ণনগর নদীয়া ফল-ফুলের ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে।

॥ ফল-ফুল কলকাতায় সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয় ॥

কলকাতা তথা পশ্চিমবাংলার মধ্যে দিনে লাখ লাখ টাকার ফুল বিক্রি হয় বড়বাজারের গঙ্গার ধারে। ওখানে বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান, পূজার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ফুল বিক্রি হয়। বাজারটায় ঘুরলে ফুল দেখেই আপনি বুঝতে পারবেন, ঋতুটা কি চলছে বা সামনে কোন পূজা আসছে।

ফলের সবচেয়ে বড়বাজার কলকাতায় বা পশ্চিমবাংলায় হলো মেছুয়া-বাজার। বাজারে-হাটে-ট্রেনে-প্লাটফর্মে যে ফল বিক্রি হতে দেখেন, সে-সব ফল আসে ঐ মেছুয়াবাজার থেকে।

॥ খ্যাত-অখ্যাত কিছু ফল-ফুল চাষি ভাইয়ের পরিচয় ॥

কলকাতার আশ-পাশে যত হকারকে পেয়ারা, শশা বিক্রি করতে দেখেন জানবেন ওঁরা ফল পাইকারি দরে কিনে আনেন বারুইপুর থেকে। বারুইপুর একটা বিরাট অঞ্চল শুধু ফলবাগানের জন্য বিখ্যাত। ধান বা অন্য চাষ হয়তো হয় কিন্তু ফলই ওদের আয়ের প্রধান উৎস। বেকার ভাইয়েরা ওখান থেকে পাইকারি দরে যে শসা পাঁচ পয়সা দিয়ে কেনেন সেটা ওঁরা বিক্রি করেন ২৫ পয়সায়। অবশ্য ফলন কম হলে পাইকারি দাম বেড়ে যায়, তাহলেও লাভ প্রচুর। একই কথা খাটে পেয়ারা-শাক আলু-পেঁপে-সবেদা-জামরুল-কালজাম প্রভৃতির বেলায়।

॥ এ. কে. দেওয়ান, দেওয়ানবাড়ি, খড়দহ ॥

শ্রীঅজিতকুমার দেওয়ান, এম. এ. ফুলের বাগান আরম্ভ করেছিলেন নিছক শখের খাতিরে। তাঁর সেই শখ তাঁর বংশধরদের বেলায় দাঁড়ালো পেশায়। আমি যেদিন দেখা করতে যাই, দুর্ভাগ্য আমার, দেখা পেলাম না তাঁর। দেখা হলো তাঁর ছেলের সঙ্গে—ভীষণ ব্যস্ত। কয়েক হাজার ডালিয়ার চারা সাজিয়ে-গুছিয়ে অর্থাৎ চারা চিনে বেছে শিকড়ে মস্ লাগিয়ে কাগজে মুড়ে প্যাকিং করে রাজধানী এক্সপ্রেস ধরাতে হবে। বেলা তখন দশটা। প্রায় ৪ ঘণ্টা ঘুরে ঘুরে এ. কে. দেওয়ানের বাগান এবং কাজকর্ম দেখলাম। প্রশ্নও করলাম ব্যস্ত মানুষটাকে ভদ্রতা বজায় রেখে। তিনি উত্তরও দিচ্ছিলেন কাজের ফাঁকে ফাঁকে। বললেন, দেওয়ান উপাধি তাঁদের মুর্শিদাবাদের নবাবদের থেকে পাওয়া। দিল্লির নানা বড় বড় প্রতিষ্ঠানে, এমনকি রাষ্ট্রপতির বাগানে পর্যন্ত

তাঁরা ডালিয়ার চারা পাঠান। তাঁদের প্রতিষ্ঠানের রমরমার কারণ হল তাঁরা বিদেশ থেকে চারা এনে গাছ তৈরি করে সেই গাছের চারার ব্যবসায় করেন। কাগজপত্তরও আমাকে দেখালেন। আই. সি. আর-এর চিঠি, যাতে ভারত সরকার জানিয়েছে উন্নত জাতের চারা বীজ আনার ব্যাপারে ভারত সরকারের কোনো বাধা-নিষেধ নেই। কথা প্রসঙ্গে জানলাম তাঁদের প্রতিষ্ঠানটির নাম "সুবারবন হর্টিকালচারাল গারডেন"। হাজারিবাগে তাঁদের আরেকটি বাগান আছে। সেখানে চাষ হয়, ডালিয়া, চন্দ্রমল্লিকা, গোলাপ, পাতাবাহার (ক্রোটন)। কোলকাতায় আছে অফিসঘর।

দেওয়ান সাহেব আরও বললেন, তাঁদের দুটি বাগানের মোট জমির আয়তন ৪ বিঘে। তিরিশজন লোক স্থায়ীভাবে কাজ করে। একজন ম্যানেজার। কাজের চাপ পড়লে অতিরিক্ত আরও দৈনিক ২-৪ জন লোক নেওয়া হয়। ব্যবসায়ের পুরো মরসুম জুলাই থেকে আগস্ট পর্যন্ত। ফুল চাষ হয়—চন্দ্রমল্লিকা-ডালিয়া-গোলাপ-ক্রোটন। ৩০০ প্রজাতির চন্দ্রমল্লিকা, ৩৫০ প্রজাতির গোলাপ এবং ১৮০ ধরনের ক্রোটন (পাতাবাহার)।

ব্যবসায়ের মূলসূত্র কি জানতে চাইলে বললেন, পুরোপুরি নিজেকে ব্যবসায়ে রাখতে হবে। চুরির ঝামেলা বাড়বে কর্মচারি যখন চারা চিনে যাবে।

॥ জগুবাবুর বাগান ॥

রিক্সাওয়ালাই বলছিল, এখানে দুটি ফুলের বাগান আছে। দেওয়ান এবং জগুবাবুর। রিক্সায় যেতে যেতে ভাবছিলাম জগুবাবুর বাগানও বোধ হয় এ. কে. দেওয়ানের মত বিরাট কিছু হবে। ঠিকানায় পৌঁছাতেই থমকে গেলাম, রিক্সা থামল বিরাট গেটওলা এক বাড়ির সামনে। গেট ঠেলে ভেতরে ঢুকে হতাশ হলাম। আমি যেন সরাসরি কোন পরিবারের মধ্যে ঢুকে গেলাম। সত্যি তাই। এক ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলা কথা বলছিলেন। বাগানের কথা বলতেই আশপাশটা দেখালেন। দেখলাম ফাঁকা চত্বরটার মধ্যে ছোট-মেজো-বড়—নানা মাপের টব ছড়িয়ে আছে। ভদ্রলোকই বললেন, জগুবাবু মারা গেছেন। আমি তাঁর বংশধর। শখের বাগান আমাদের। সিজনে চারা বাল্ব বিক্রি করি। সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে পড়ল গৃহস্থের গরুর শৌখিনতা। প্রথমে পোষা হয় শখের জন্য বা সেবার জন্য। পরে যখন গাইয়ের

সংখ্যা বা দুধ বেড়ে যায়, তখনই সে অতিরিক্ত দুধ বিক্রি করে পয়সা কামায় এই অতিরিক্ত পয়সা কামাই করে চাকদা অঞ্চলের গৃহস্থকে আমি দোতালা বাড়ি তুলতে দেখেছি।

॥ নবকুমার দাস 'শান্তি নার্শারি' হাতিকান্দি, জিরাট, হুগলি ॥

এ. কে. দেওয়ানের বাগান থেকেই আমি শুনেছিলাম পশ্চিমবাংলার সেরা গ্লাডিওলাস্ ফুলের চাষ হয় হুগলি জেলার জিরাটে। জিরাট স্টেশন থেকে হাতিকান্দি বেশ দূর। শান্তি নার্শারিতে পেঁছালাম বিকেলের মুখটায়। মালিক শ্রীনবকুমার দাসকে দেখে চমকে উঠলাম। প্রখ্যাত ফিলম্ ষ্টার পালোয়ান দারা সিংকে যদি মানুষ ফুলবাগান করতে দেখে তবে বোধহয় আমারই মত অবাক হবেন। ঘটনাও তাই। শ্রীদাস রীতিমত স্বাস্থ্যের চর্চা করেন এবং দেহসৌষ্ঠবে অনেক প্রতিযোগিতায় প্রথমও হয়েছেন। ফুলবাগান তাঁর পেশা এবং দেহচর্চা তাঁর শখ। ভদ্রলোকের বাবা-কাকাদের সঙ্গে আলাপ হলো। ছাপোষা গৃহস্থ। বিস্তর এলাকা জুড়ে তাঁদের ফল-ফুল, শাক-সব্জি, পুকুর আর ক্ষেত-খামার। এককথায় আদর্শ মিশ্রখামার তাঁদের। বেশ কয়েকটি গরুও দেখলাম। হলষ্টিন্-জার্সি সংকর। ফুলবাগানে প্রচুর লাভ দেখে এখন ফুলচাষে ঝুঁকেছেন। গোলাপ ফুলের অনেক প্রাইজ সারটিফিকেট দেখালেন। জিরাট বাজারে গাড়ি-গহনা-আসবাবপত্র প্রভৃতি সাজাবার ফুলের দোকান আছে। এ. কে. দেওয়ানদের কাছেই শুনেছিলাম গঙ্গার ধারের বেলে মাটিতে গ্লাডিওলাস্ ফুলের চাষ ভাল হয়। শ্রীদাসের বাগান দেখে সেটাই সত্য বলে মনে হল। রংয়ের বাহারইবা তার কত! ভদ্রলোক আরও জানালেন এ. কে. দেওয়ানদের ম্যানেজারের বাড়ি তাঁর বাড়ির পাশেই। গর্বের সঙ্গে জানালেন শ্রীনবকুমার দাস, অনেকে গ্লাডিওলাস চাষে তাঁর কাছে হেরে যাওয়ায় ঐ ফুলের চাষই তুলে দিয়েছেন। আরও যেসব ফুলের চাষ করেন তা হল, চন্দ্রমল্লিকা, রজনীগন্ধা, গোলাপ, ডালিয়া, বেলফুল, জবা, লাল মাসুন্দা, ট্রিকোমা, বাগানভিলিয়া, গন্ধরাজ। ব্যবসায়ের ফলগুলি হল, আম, পেঁপে, লেবু। আম-চাষের প্রজাতিগুলি হলো মল্লিকা, লেংড়া, চ্যাটার্জি। জমির আয়তন ২ (দুই) একর। সারা বছরের বাঁধা কর্মচারি দশজন। মাঝে মাঝে অতিরিক্ত লোক লাগে ২-৪ জন। গ্লাডিওলাসের প্রসঙ্গে ফিরে এসে আবার তিনি গর্বের সঙ্গে বললেন, তাঁর ১৫-২০টি রংয়ের গ্লাডিওলাস্ রয়েছে। নাম-করা প্রজাতিগুলি হল, অস্কার, হানবারণ, নিউগ্রেন্, হার ম্যাজেষ্টি। নিউ

মারকেট্ তাঁর গ্লাডিওলাস্ ফুল কিনে নেয়। লাভ নামমাত্র। 'ষ্টিক' (অর্থাৎ, একটি কাণ্ডের ওপর যে ফুল থাকে) প্রতি লাভ মাত্র ২৫ পয়সা। ঝামেলা প্রচুর ফুল পাঠাতে। ট্রেন-গাড়ির ঝামেলা হলেই ফুল পাঠানো যায় না। তবু অর্ডার ধরে রেখেছেন সুনাম এবং প্রচারের জন্য। কথা প্রসঙ্গে জানালেন, পশ্চিমবাংলায় সবচেয়ে ভাল গ্লাডিওলাস্ হয় কালিম্পংয়ে। তাঁর মতে সবচেয়ে ভাল গোলাপ চাষ হয় কাঁকুরে মাটিতে। দেখবেন পুরানো বিরাট বিরাট বাড়ির বাগানে যে সব কাঁকর বিছানো পথ আছে—সেই সব কাঁকর বিছানো পথের ধারে ধারে সেরা গোলাপ ফুল হয়ে থাকে।

একজনের সুখ্যাতি বা ব্যবসায়ের সাফল্য এলেই অপরে হিংসা করে, কেউ কেউ চেষ্টা করে লোকটার পথে এগিয়ে আমরাও লাভবান হতে পারি কিনা। তা পরখ করে দেখতে জিরাট অঞ্চলের ভীম সরকার, হিলি চক্রবর্তী এই পথেই কি ফলফুলের চাষে সার্থক হয়েছেন?

॥ শ্রী মতিলাল হালদার, কৃষিপল্লী, ফুলিয়া, নদীয়া ॥

খুব ভোরে গিয়েছিলাম কৃষিপল্লীর শ্রী মতিলাল হালদারের ফুল বাগানে। ভদ্রলোকের আগে ছিল ধান গম পাটের চাষ। হঠাৎ তিনি ঝুঁকলেন ফুল চাষের দিকে। লাভও পেলেন। তারপরেই তিনি মতিগতি পাল্টে ফুল চাষের

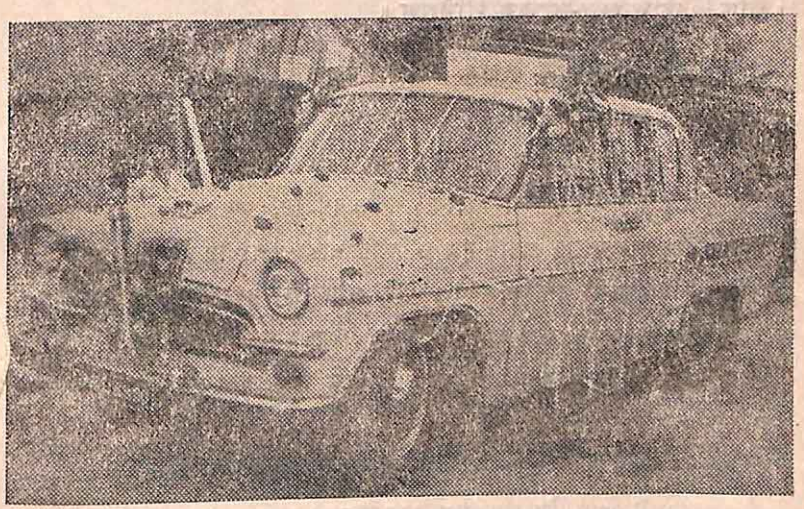

দিকে পুরোপুরি ঝুঁকলেন। বাজারে তাঁর একটা দোকান আছে ফুলের। ফুলেরই গয়না-মুকুট-চেয়ার-টেবিল গাড়ি সাজানো থেকে মালা, তোড়া, এবং

শুধু রজনীগন্ধার গুচ্ছ পর্যন্ত বিক্রি করেন। তিনি গোলাপের চাষ করেন না। দরকার পড়লে গোলাপ বড়বাজার থেকে কিনে আনেন স্থানীয় চাহিদা মেটাতে। কলকাতার বড়বাজারে তার নিত্য আনাগোনা ফুল বিক্রি করতে আর কিনতে। মরসুম আর পূজা বুঝে তিনি ফুল আনেন। তাঁর মতে কনের ফুলের মুকুটে বা গাড়িতে গোলাপের থেকে মোরগঝুঁটি ফুল ব্যবহার করা অনেক ভাল। গন্ধ অবশ্য নেই মোরগ ঝুঁটির, কিন্তু দেখতে সুন্দর শক্ত আর টেঁকসই। গোলাপের জায়গায় অনায়াসে বসান যায়। তিনি আরও বললেন, মোরগ ঝুঁটির অনেকগুলি রং গহনায় আর সাজানো গাড়িতে নতুনত্ব এনে দেয়। মোরগ ঝুঁটির রংগুলি হলো,—লাল, খয়েরি (ভায়োলেট্) হলুদ আর সাদা। তিনি রজনীগন্ধা ফুলে গাড়ি, কনের গহনা এবং খাট বা বিছানা সাজাতে নেন—যথাক্রমে ১০০-২৫০ টাকা, ২০-২৫ টাকা, এবং ১০-১৫ টাকা। তাঁর জমিতে বিঘে প্রতি রজনীগন্ধা ফলন ১৫-১৬ কেজি, দাম কেজি প্রতি ৩ থেকে ৩০ টাকা পর্যন্ত।

তিনিই জানালেন, রজনীগন্ধা চাষ করে বিঘে প্রতি ধানের চেয়ে দু হাজার টাকা বেশি পাওয়া যায়। শ্রীহালদার আরও বললেন, গ্লাডিওলাস্ থেকে রজনীগন্ধার ডাঁটি বেশি শক্ত।

॥ গাছ ও তার ফল-ফুলের পরিচয় ॥

উদ্ভিদ বা গাছ দুটি প্রধান জিনিস জন্মসূত্রে পেয়ে থাকে। সে দুটি হলো, (ক) মূল—সেটা মাটির নিচে চলে যায় এবং (খ) বিটপ সেটা মাটির ওপর বেড়ে ওঠে। বিটপের রং সবুজ এবং এই বিটপেই থাকে কাণ্ড শাখা-পাতা-ফুল আর ফল। মূল বা গাছের শিকড় বর্ণহীন, মূল বা গাছের শিকড় আবার ভাগ হয়ে যাচ্ছে প্রধান মূল ও তার শাখা-প্রশাখায়। মূলের শেষ গতি মূলরোম। গাছেরই শিকড়, কাণ্ড আর পাতাকে বর্ধনশীল অঙ্গ বলা হয়। যেহেতু এরা সব সময় বেড়ে যায়। ফল ফুল, এদের অন্য একটা বিরাট ভূমিকা রয়েছে। ফল-ফুল আর বীজকে গাছের জনন অঙ্গ বলা হয় যেহেতু অনুকূল অবস্থায় বংশবিস্তারের কাজে আসে ওরা।

গাছের কাণ্ড আর তার শাখা-প্রশাখা দুটি কাজ করে থাকে। প্রথমতঃ সমস্ত গাছকেই এরা উপযুক্তভাবে ধরে রাখে। ফলে পাতা আলোক আর বাতাসের সংস্পর্শে আসে এবং গাছ বেড়ে ওঠে। দ্বিতীয় কাজ হলো কাণ্ড আর তার শাখা-প্রশাখার বিভিন্ন পদার্থকে দ্রব অবস্থায় পাতা আর অন্যান্য

অংশে পৌঁছে দেওয়া এবং দরকার মতো আবার গাছের শিকড়ে ফিরিয়ে আনা। পাতার কাজ হলো উদ্ভিদের বাড়া এবং তার পরিণতির জন্য খাবার জুগিয়ে যাওয়া।

ফুলের মধ্যে থাকে জনন-অঙ্গ যা থেকে হয় ফল এবং পরে বীজ। ফুল মাত্রই অবশ্য সৌন্দর্যের প্রতীক, তবে আমরা ফুলও খেয়ে থাকি, যেমন, ফুলকফি। বীজধারণ গাছের চরম পরিণতি কারণ বীজ থেকে নতুন গাছ সৃষ্টি হয়।

গাছের প্রধান শিকড় আর তার শাখা গাছকে শক্তভাবে মাটির সঙ্গে আটকে রাখে। শিকড়ের অসংখ্য শাখা-প্রশাখার শেষ পরিণতি মূলরোমে। এরাই মাটির খুবই ছোট-ছোট কণার সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসে। মাটি-কণার সংস্পর্শে এসে মাটির জলে গলা ঠিক ঠিক পদার্থগুলি শোষণ করে।

॥ বীজ ॥

ফসলের বীজ একটা আবরণে ঢাকা থাকে। এটাকেই বলে খোসা। পেকে উঠে বীজ মুক্ত হয় এবং অনুকূল অবস্থায় নতুন গাছ সৃষ্টি করে।

বীজের তিনটি অংশ, (ক) খোসা থাকে একদম বাইরে। (খ) বীজপত্র —থাকে খোসায় ঢাকা, (গ) ভ্রূণ। খোসা বীজকে রক্ষা করে আর বীজপত্রের মধ্যে থাকে ভবিষ্যতের চারার জন্য খাবার। অঙ্কুরোদ্গম বা সুপ্ত বীজের জীবন লক্ষণ প্রকাশের সময় ভ্রূণ এই খাবার ব্যবহার করে। সুতরাং ভ্রূণ সৃষ্টি করছে চারায় এবং চারা থেকে সৃষ্টি হচ্ছে গাছের।

॥ মুকুল ॥

শিশু চারা গাছে প্রধান বিটপ বা কাণ্ডের একেবারে আগায় একটি মুকুল থাকে। বলতে গেলে একটা গাছের সবকিছু ঐ অগ্র মুকুলেই থাকে। গাছের কাটিং, চারায় সব সময় ঐ অগ্রমুকুলটি দেখে নিতে হয়। মুকুলের রং সবুজ।

মুকুল দু-ধরনের—অগ্রমুকুল ও পার্শ্বীয় মুকুল। অগ্রমুকুলের কথা আগেই বলা হয়েছে। পার্শ্বীয় মুকুল থাকে পাতার কোণে অর্থাৎ পাতার নিচে এবং গাছের কাণ্ড বা শাখার মধ্যে যে কোণের সৃষ্টি হয় তার মধ্যে।

পাতা যে মুকুল থেকে বের হয় সেটা পত্রমুকুল এবং যে মুকুল থেকে ফুল বের হয় সেটা পুষ্পমুকুল। মুকুল অস্বাভাবিক কোনো জায়গায় কাণ্ডের কোনো অংশে পাতা বা মূলের কোনো অংশে বের হলে সেটা হলো অস্থানিক মুকুল।

॥ মাটির তলার কাণ্ড, ফল-ফুল ব্যবসায়ে যার ভূমিকা আছে ॥

মাটির তলার কাণ্ড নাম শুনেই নিশ্চয় বুঝতে পারছেন মাটির তলায়ই

বাড়ে এবং কিছুটা গাছের শিকড়ের সঙ্গে ভুল হয়। অবশ্যই কাণ্ডের কোল থেকেই মুকুল বের হয়। এদের দেখতে সবুজ নয়।

॥ **রাইজোম** ॥ মটির নিচে আনুভূমিকভাবে রাইজোম বৃদ্ধি পায়। রজনীগন্ধা রাইজোমের উদাহরণ। পর্বমধ্য বা গাছের দু-গাঁটের মাঝের জায়গা খুব ছোট। পর্ব থেকে অস্থানিক মুল বের হয়। অগ্র বা পার্শ্বীয় মুকুল থেকে কাণ্ড বা শাখা জন্মায়। রাইজোম খাবার মজুত রাখে।

॥ **কন্দ (Bulb)** ॥ ছোট চেপ্টা কাণ্ড সঙ্গে থাকে মোটা শল্কপত্র (কচিপাতা)। গা থেকে অস্থানিক শিকড় বা মূল জন্মায়। থাকে ১টি বা ২টি পার্শ্বীয় মুকুল। ডালিয়ার বাল্ব বা কন্দ ফুলচাষে ব্যবহার করা হয়।

॥ **করম্ বা গেঁড় (Corm)** ॥

করম্ বা গেঁড় হচ্ছে গাছের মাংসল, শক্ত, ঘন এবং লম্বা কাণ্ড। কিছুটা বা লম্বাটে আকারের। করমে খাবার বিশেষ করে স্বেতসার জাতীয় খাবার মজুত থাকে। নিচের বা কাণ্ডের সব জায়গা থেকে অস্থানিক ঝুলান বা ঝুলান শিকড় থাকে। পার্শ্বীয় মুকুল, পর্ব এবং মধ্য পর্ব বেশ পরিষ্কার। সামনে থাকে অগ্রমুকুল। অনুকূল পরিবেশে বিটপ প্রকাশ পায় এবং সেটা করম থেকে তার খাবার জোগাড় করে নেয়। নতুন বিটপ আবার সুযোগ মতো নতুন করম্ তৈরি করে। বিখ্যাত ফুলের গাছ গ্লাডিওলাস্ করম্ বা গেঁড় জাতীয় গাছের সুন্দর উদাহরণ।

॥ **গাছের পাতা** ॥

গাছের শাখা-প্রশাখার পর্ব থেকে পাতা গজায়। রং তার সবুজ। পাতা কাণ্ডের সঙ্গে পত্রমূল বা বোঁটার সঙ্গে লাগানো থাকে। পাতার চওড়া চেপ্টা পাতলা অংশকে ফলক বলে। ফলকে থাকে অসংখ্য শিরা উপশিরা আর তার জালিকা। জালিকায় থাকে অসংখ্য কোষ। এসব কোষের মধ্যে ক্লোরোফিল নামে রঙ্গক থাকে। ওরাই গাছের খাবার তৈরি করতে সাহায্য করে।

ফুলের সৌন্দর্যের জন্য, ফুলকে রক্ষায়, অন্য জিনিসের সাহায্য পাবার জন্য, এবং খাবার তৈরিতে পাতার রূপান্তর ঘটে :

১. **বীজপত্র** ॥ গাছের ওরাই প্রথম পাতা। ওদের মধ্য খাবার জমা থাকে। বেড়ে ওঠা ভ্রূণ ঐ বীজপত্র থেকে খাবার গ্রহণ করে। আম, পেয়ারা, আপেল প্রভৃতির বীচি বীজপত্রের উদাহরণ।

২. **পুষ্পাধরপত্র** ॥ পুষ্পেরই অংশবিশেষ। নানা রং আকার দিয়ে

ফুলের সৌন্দর্য বাড়িয়ে দেয়, বোগনভেলিয়ার নানা রং পুষ্পধর পত্রের জন্য হয়।

৩. **পত্রকণ্টক** ॥ অনেক সময় পাতা কাঁটায় পরিণত হয়, যেমন, গোলাপ এর উদ্দেশ্য হল গাছকে রক্ষা করা।

৪. **পত্রাকর্ষ** ॥ পাতার আঁকষি বিশেষ। বেড়ে ওঠা গাছকে এই আঁকষিই অন্য কিছু অবলম্বনকে জড়িয়ে ধরে গাছকে খাড়া রাখাতে সাহায্য করে। মটর ও সুইটপী এর উদাহরণ।

॥ **ফুল** ॥

পুষ্প জনন অঙ্গ ধারণ করে এবং এই থেকেই ফল হয়। ফল থেকে বীজ। আদর্শ ফুল একটি দণ্ড বা ডাঁটার ওপর থাকে এবং এই দণ্ডই ফুলকে মেলে ধরে। পুষ্পদণ্ডের আগার দিকটাকে বলে পুষ্পাধার আর এর উপরেই বৃত্যংশ, পাপড়ি, পুংকেশর ও গর্ভকেশর আবর্ত বা একটা কেন্দ্রকে ঘিরে সাজানো থাকে। বৃত্যংশগুলি শল্ক বা কচিপাতার মত ফুলের নিচের দিকের সবুজ অংশ বিশেষ এবং এইগুলিকে একসঙ্গে বলা হয় বৃতি। মুকুল অবস্থায় এরা পুষ্পের অন্যান্য অংশকে রক্ষা করে। ফুলের কুঁড়িতে সাধারণত আমরা এই বৃতিই দেখি।

পাপড়িগুলি বৃতির ভেতরে গোল করে থাকে সাজানো। পাপড়ির সংখ্যা সবসময় বৃত্যংশের সংখ্যার সমান। পাপড়িদের একসঙ্গে বলা হয় দলমণ্ডল। পাপড়ি রঙিন হলে ফুল হয় রঙিন।

পুংকেশরগুলি দলমণ্ডলের ভেতরে থাকে আর এদের সংখ্যা ফুলের জাত অনুসারে নির্ভর করে। পুংকেশর দেখতে সরু ডাঁটা বা কাঠির মতো। আগা গোল বা চেপ্টা। এর নাম পরাগধানী। পরাগধানীর ভেতরে থাকে চারটে থলে, নাম পরাগস্থলী। এদের ভেতরে পরাগরেণু তৈরি হয়। পরাগরেণুর আকার গোল বা ডিমের মত। পরাগধানী উপযুক্ত হলে সেটা ফেটে যায় আর বেরিয়ে পড়ে পরাগরেণু।

গর্ভকেশর বা গর্ভপত্র ফুলের ঠিক মাঝখানটায় থাকে। গর্ভকেশরের নিচের সামান্য মোটা অংশকে ডিম্বাশয় বা বীজের বাক্স বলা হয়। ওর মাঝে থাকে অপরিণত বীজ বা ডিম্ব। এটাই ফুলের স্ত্রীপ্রজনন অংশ। গর্ভাশয় বা ডিম্বাশয়ের ওপরের সরু অংশকে বলে গর্ভদণ্ড। গর্ভদণ্ডের আগার মোটা অংশকে বলে গর্ভমুণ্ড।

একই ফুলে পুংকেশর আর গর্ভকেশর উপস্থিত থাকলে সেই ফুলকে বলা হয়

15282

উভলিঙ্গ। কেবলমাত্র একটি পুংকেশর বা গর্ভকেশর থাকলে ফুলকে বলা হয় **একলিঙ্গ ফুল**। একলিঙ্গ ফুল দুই প্রকার,—পুংপুষ্প ও স্ত্রীপুষ্প। যদি স্ত্রীপুষ্প এবং পুংপুষ্প একই গাছে, যেমন ধরুন শশা গাছে ছাড়িছাড়ি ভাবে থাকে তবে ঐ গাছকে বলব সহবাসী গাছ। ভিন্ন ভিন্ন গাছে স্ত্রীপুষ্প ও পুংপুষ্প থাকলে সেই গাছকে বলব ভিন্নবাসী। পেঁপে, খেজুর ভিন্নবাসী গাছের উদাহরণ।

আম-কমলালেবু-আঙ্গুর উভলিঙ্গ ফুলের উদাহরণ। ভুট্টা একলিঙ্গের।

॥ ফল-বীজ ॥

পরিণত ডিম্বাশয় হলো ফল আর ডিম্ব হলো বীজ। ডিম্বাশয়ের বাইরের পাকা আবরণটি হলো খোসা। এই খোসা ভেতরের ফল আর বীজকে রক্ষা করে।

বীজ হবার আগে গাছে পরাগযোগ ও গর্ভাধান হয়। পরাগধানীর মধ্যে থাকে পরাগরেণু। পরাগরেণু পুরুষ জনন-কোষ এবং ডিম্বাশয়ের মধ্যে স্ত্রী-জনন-কোষ তৈরি করে।

পরাগযোগ দুভাবে হয়। একই ফুলের পরাগানী থেকে পরাগরেণু সেই ফুলের গর্ভমুণ্ডে চলে গেলে, বলা হয়ে স্ব-পরাগযোগ। একই প্রজাতির একটি গাছের পরাগরেণু অপর একটি গাছে গর্ভমুণ্ডে গেলে ইতর পরাগযোগ হয়। কোন কোন গাছে স্বপরাগযোগ না ঘটলে গাছে ফুল ফোটা সম্ভব নয়। ফলে তাদের স্বপরাগযোগ হতে বাধ্য। আম-কমলালেবু-আঙ্গুরে স্বপরাগযোগই হয়। বায়ু-কীটপতঙ্গ-জল-শামুক-পাখি প্রভৃতির দ্বারা ইতর পরাগযোগ হয়।

ফুল, যেমন ফুলকপি খেয়ে থাকলেও আমরা ফলকে নিয়ে সাধারণতঃ হামলে পড়ি। মুকুলও বাদ পড়ে না, যেমটি বাঁধাকপি। পুরো তৈরি ডিম্বাশয় থেকে ফল জন্ম লাভ করে। এটাই প্রকৃত ফল, যেমন, টোমেটো-শশা-আম-আঙ্গুর। অন্যান্য অংশ থেকে তৈরি গাছের খাবারকে বলা হয় অপ্রকৃত ফল। আপেল ন্যাসপাতি-কাজুবাদামের বেলায় পুষ্পাধারই তথাকথিত ফল তৈরি করে। ডুমুর-তুঁতফল-আনারস-কাঁঠাল পুষ্পবিন্যাস থেকে তৈরি অপ্রকৃত ফল।

ফল একক, যেমন আম বা গুচ্ছিত। গুচ্ছিতের উদাহরণ আতা-কাঁঠাল প্রভৃতি হতে পারে।

ফলকে দু শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। নীরস আর সরস। নীরস আবার তিনভাগে বিভক্ত, (ক) অবিদারি (বাদাম-বেদনা), (খ) বিদারি (শিম

মটর), (গ) ভেদক (ধান)। সরস ফলের উদাহরণ,—আম-বাদাম-আপেল-কাঁঠাল-আনারস-আঙ্গুর প্রভৃতি।

॥ মাটি ॥

মাটিই খাঁটি। পৃথিবীর বুকে যাবতীয় গাছপালা সম্ভব হয়েছে দুটি মাধ্যমের জন্য,—আবহাওয়া এবং মাটি। দুটির মধ্যে মাটির গুরুত্ব বেশি। যেহেতু মাটি গাছকে দিচ্ছে আশ্রয়, পুষ্টি এবং মাটির মধ্যে দিয়েই বাতাস অক্সিজেন জোগাচ্ছে গাছের শিকড়দের। মাটির উৎস পাথর বা শিলা,—যেটি অনেক সময় ধরে ভেঙ্গে মাটিতে পরিণত হয়েছে। শুধু তাই নয়, এর মধ্যে আছে জটিল খনিজ যৌগিক পদার্থ, জৈব পদার্থ, জল, বাতাস, জীবাণু, ছত্রাক, এককোষী প্রাণী, কীট, কেঁচো, প্রভৃতি জীব। চাষের যোগ্য মাটি হলো,

১. **পলিমাটি** ॥ অর্থাৎ নদী আর তার উপকূলে এবং বদ্বীপের পলি দ্বারা তৈরি। পলিমাটিতে সাধারণতঃ নাইট্রোজেন এবং হিউমসের অভাব থাকে আর কোন কোন সময় বা ফসফরাসের অথবা পটাসের পরিমাণ খুব বেশি। চুন বা ক্যালসিয়াম কোথাও খুব বেশি, কোথাও খুব কম।

পলিমাটি সব ধরনের ফলমূল চাষের উপযোগী।

হিউমাস তৈরি হয় কাদা এবং বালির মিশ্রণের মধ্যে।

২. **কালোমাটি** ॥ বা কৃষ্ণমৃত্তিকা কালো থেকে হাল্‌কা-কালো বা বাদামি রংয়ের পর্যন্ত হতে পারে। কালো রং হবার কারণ হল—এর মধ্য আছে টিটানিফোরাস্ ম্যাগনাটাইট, লোহা, জৈব অ্যালুমিনিয়াম্, মজুত হিউমাস্, লোহা এবং অ্যালুমিনিয়াম্ সিলিকেট্।

কালোমাটিতে সাধারণতঃ নাইট্রোজেন, ফসফোরিক অ্যাসিড, এবং জৈব পদার্থের অভাব থাকে। কিন্তু প্রচুর পরিমাণ পটাস, লোহা, চুন, অ্যালুমিনা, ক্যালসিয়াম্, ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট আছে। ভিজে অবস্থায় কালো মাটি খুবই নরম কিন্তু শুকিয়ে গেলে হয় ইটের মত শক্ত। ভাল জল নিকাশি ব্যবস্থা থাকলেও কালো মাটির আর্দ্রতা বেশি। এই মাটি মোটামুটি উর্বর এবং কোনো সার দেওয়া না হলেও এবং বারবার চাষ সত্ত্বেও সব সময় মোটামুটি ফলন দেয়। বিভিন্ন প্রকারের শাকসব্জি, কিছু ফল, বিশেষ করে লেবু—কালোমাটিতে ভাল হয়। এই মাটি তুলা চাষের পক্ষে আদর্শ।

৩. **লালমাটি** ॥ পশ্চিমবাংলার বীরভূম-বাঁকুড়া-মেদিনীপুর জেলায় দেখা

যায়। এটি দুটি জিনিস নিয়ে তৈরি। লাল দো-আঁশ এবং হলদে মাটি। যে শিলা থেকে এই মাটি তৈরি তাতে একসময় ম্যাগেনেসিয়াম খনিজ পদার্থের প্রাচুর্য ছিল। লাল মাটির কাদা অংশে সিলিকা-অ্যালুমিনা অনুপাত ১:২-র ওপরে এবং এতে প্রচুর পরিমাণে লৌহ অক্সাইড্ খনিজ আছে। এই মাটিতে নাইট্রোজেন-হিউমাস-ফসফোরিক অ্যাসিড এবং চুনের ঘাটতি আছে। বৃষ্টি বা সেচের জল থাকলে লাল মাটিতে সব ধরনের ফসল ফলানো সম্ভব।

৪. **ল্যাটেরাইট জাতীয় মাটি**॥ সাধারণতঃ ল্যাটেরাইট মাটিতে নাইট্রোজেন-ফস্ফোরিক অ্যাসিড-পটাস-চুন এবং ম্যাগেনেসিয়ামের অভাব থাকে। যদিও এই মাটির মোটের ওপর উর্বরতা কম তবুও সার দিয়ে এবং যত্নের সঙ্গে চাষ করলে ফসলে ভালো সাড়া পাওয়া যায়। আখ এবং ধান এই মাটিতে ভাল হয়। পাহাড়ি অঞ্চলে সাধারণতঃ ল্যাটেরাইট্ মাটি দেখা যায়।

৫. **পর্বত এবং পাহাড়ে মাটি**॥ বন বেড়ে যাওয়ার ফলে গাছপালার ফেলে দেওয়া জৈব পদার্থ দ্বারা গঠিত। দুটি কারণে পর্বত তথা পাহড়ি মাটি জন্ম নেয়, (অ) অম্ল কাঁচা হিউমাস এবং অল্প-ক্ষার অবস্থায় তৈরি মাটি যেটা পডজল গঠনে অনুকূল। (আ) অল্প-অম্ল অথবা প্রশমিত অবস্থায় (PH = 7) খুব বেশি ক্ষারযুক্ত মাটির সঙ্গে তৈরি যেটা পরে বাদামি মাটিতে রূপান্তরিত হয়।

৬. **বিশুষ্ক এবং মরু-মাটি**॥ মরু অঞ্চলে এই মাটি দেখতে পাওয়া যায়।

৭. **লবন এবং ক্ষারীয় মাটি**॥ উত্তর ভারতের একেবারে শুকানো এবং মাঝারি শুকানো জায়গাগুলিতে বিশেষ করে বিহার-উত্তরপ্রদেশ-পাঞ্জাব-রাজপুতানায় মাটি থেকে লবন এবং ক্ষারীয় বুদবুদ এসে এ-ধরনের মাটি তৈরিতে সাহায্য করে। মাটি সংশোধন না করে এ ধরনের মাটিতে চাষ করা উচিৎ নয়। এই মাটির লবনগুলি হল—সোডিয়াম-ক্যালসিয়াম্ এবং ম্যাগনেসিয়াম্।

৮. **পিট এবং অন্যান্য জৈব মৃত্তিকা**॥ এধরনের মাটিতে প্রচুর পরিমাণে জৈব পদার্থের সঞ্চয় ঘটে। নদীর অববাহিকা এবং হ্রদ শুকিয়ে যাবার ফলে যে নিচু জমি তৈরি হয় তাতে মাটির অদ্ভুত জলবসা এবং মাটির অবায়ুজীবী অবস্থা দেখা যায়। মাটির রং হয় লাল—জৈব পদার্থ এবং লোহার উপস্থিতির জন্য। পশ্চিমবাংলার সুন্দরবন এবং অন্যান্য স্থানে এ-জাতের মাটি

দেখা যায়। পিট এবং অন্যান্য জৈব মাটির রং কাল। ওজনে ভারি এবং মাটিতে অম্লের ভাগ বেশি। প্রশম (PH) কখন কখন খুবই কম, ৩:৯ এর মত। এই মাটিতে শতকরা ১০·৮০ ভাগ জৈব পদার্থ, ২০-৩০ ভাগ লোহা, এবং আলুমিনিয়াম্ অক্সাইড থাকে।

ফসফোরিক অ্যাসিডের পরিমাণ খুবই কম। কোন রকম নাইট্রোজেন সংযোগ সম্ভবপর হয় না। ফলে মাটি ফল-ফুল গাছের পক্ষে বিষাক্ত হয়ে দাঁড়ায়।

॥ কি ভাবে মাটি চিনবেন ॥

(১) যদি মাটির রং গাঢ়-বাদামি থেকে কালো রং হয় তবে বুঝতে হাবে মাটিতে প্রচুর হিউমাস আছে। এবং এই কালো মাটি দেখে বুঝতে হবে মাটির গঠন ভালো এবং এতে যথেষ্ট পরিমাণে ক্যালসিয়াম এবং নাইট্রোজেন আছে। এক কথায় এ-মাটি খুবই উর্বরা।

(২) ল্যাটেরাইটের লাল এবং বাদামি রংয়ের সঙ্গে ভালোভাবে বাতাস খেলে যাওয়া এবং জল বেরিয়ে যাবার ব্যাপার দুটির যোগ রয়েছে। উৎকৃষ্ট জলনিকাশি মাটিতে লোহার ফেরিক যৌগ গঠিত হয়, সেজন্য মাটির রং হয়ে যায় লাল বা বাদামি। অপরদিকে যেসব মাটির জল ভালো করে বের হয়ে যায় না, সেখানে তৈরি হয় লোহা-অক্সাইড —ফলে মাটির রং হয় হলুদ।

(৩) আর্দ্র অঞ্চলে লাল অথবা হলুদ মাটিতে প্রচুর পরিমাণে জৈব পদার্থ ঢেলে বাদামিতে পরিণত করা যায়

(৪) ক্ষারীয় লবনের খুব বেশি মাত্রায় উপস্থিতির ফলে এবং লবনের প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে মাটির রং কালো অথবা সাদা হতে পারে। চাষের পক্ষে এ মাটি অনুপযুক্ত।

॥ মাটির সংশোধন ॥

চাষে অনুপযুক্ত হয় যদি মাটিতে অতিরিক্ত মাত্রায় অম্ল, ক্ষার বা লবন থাকে। কিন্তু আপনার জমির মাটিতে ঐ দোষ আছে বলে আপনি কি চাষ করবেন না? অবশ্য করবেন তবে সংশোধন করে নিয়ে।

মাটি সংশোধনের আগে সবচেয়ে ভালো হয় যদি আপনি আপনার জমির মাটি পরীক্ষা করিয়ে নিতে পারেন। এই মাটি পরীক্ষা আপনাকে বিনামূল্যে করিয়ে দিতে পারে,—বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, পোঃ মোহনপুর, জেলা—নদীয়া অথবা জেলার প্রিন্সিপ্যাল বা এগ্রিকালচারাল অফিসার। এই শিক্ষা

প্রতিষ্ঠান শুধু মাটি পরীক্ষা করবে না—আপনাকে বিস্তৃত উপদেশ দেবে যাতে সেই মাটি থেকে আপনি বেশি পরিমাণে ফল-ফুল পেতে পারেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবিধা না থাকলে আপনি এবিষয়ে পরামর্শ পাবেন আপনার সবচেয়ে কাছের কৃষিদপ্তর থেকে। মাটি পরীক্ষা করে—রানীকুটির, টালিগঞ্জ, কলিকাতা, এবং পি. এ. ও বর্ধমান, কুচবিহার।

॥ মাটির অম্লতার সংশোধন ॥

অনেক ভাবেই মাটির অম্লতা দূর করা যায়। চুণের অনেক গুণ অম্লতা দূর করতে সবচেয়ে ভালো চুন। চুন শুধু অম্লতাই সংশোধন করে না, রাসায়নিক সার দেবার আগের কাজটা করে দেয়। জীবাণুদের কাজের গতি বাড়ায়, মাটির গঠনের উন্নতি করে। সবুজ সার এবং শুঁটি জাতীয় আচ্ছাদনী ফসলের বাড় সহজ করে দেয়। চুন লাগাবেন নিচের হিসেব মতো।

কি ধরনের মাটি :	কতটা চুন লাগবে (টন প্রতি হেক্টরে)				
	প্রশম (PH ৪·০ হতে)		প্রশম (PH ৪·৫ হতে)		প্রশম (PH ৫·৫ হত)
উষ্ণ আদ্র সমভূমি :	টন		টন		টন
বালি এবং দো-আঁশ বালি	৩¾	—	২½	—	১¾
বালি দো-আঁশ	—		৫	—	২½
দো-আঁশ এবং পলি দো-আঁশ	—		৮¾	—	৫
মেটেল	—		১২½	—	৭½
শীতল নাতিশীতোষ্ণ পাহাড় :					
বালি এবং দো-আঁশ বালি—	৭½	—	৫	—	২½
বালি দো-আঁশ	—		৭½	—	৫
দো-আঁশ এবং পলি দো-আঁশ—	—		১১¾	—	৭½
মেটেল—	—		১৫	—	৮¾
উপত্যকার মাটি :					
জৈব জলবসা—	২২½	—	১৭½	—	১১¾

॥ লাবণিক মাটি সংশোধন ॥

খুব কম খরচে লাবণিক মাটির সংশোধনের উপায় হলো মাটি ধুয়ে ফেলা এবং ধুয়ে ফেলতে দরকার উপযুক্ত জল নিষ্কাশন-ব্যবস্থা। জলপীঠ (অর্থাৎ

যেখানে জল জমা থাকে) গাছের শিকড়ের জটলা থেকে অন্ততঃ আট-দশ ফুট নিচে রাখতে হবে। স্বাভাবিক জল নিষ্কাশন বা জল বের করবার উপায় না থাকলে কৃত্রিমভাবে জল বের করার ব্যবস্থা করতে হবে।

জল বের করার দরকার লবন ধুয়ে ফেলা। বাষ্পীভবন এবং বাষ্পমোচনের জন্য যত জল দরকার তার চেয়ে বেশি জল ঢালতে হবে। জলে লবনের পরিমাণ, কি ধরনের মাটি, মাটিতে জমা লবনের পরিমাণ প্রভৃতি কারণের ওপর জলের পরিমাণ নির্ভরশীল। মোটামুটিভাবে বলা যায়, সেচের জন্য যে জল প্রয়োজন তার চেয়ে ৫% ৩০% থেকে বেশি জল দরকার লবন ধুয়ে ফেলতে। জমিতে প্রশম লবন (Neutral PH = 7) বেশি থাকলে জমি জলে ডুবিয়ে খোলা নালার সাহায্যে যতটা সম্ভব লবন বের করে দিয়ে তবেই জমি আবার জল দিয়ে ধুয়ে ফেলবার ব্যবস্থা করা উচিৎ। ভারি যন্ত্রের সাহায্যে চাষ হলে,—জমির ওপরটা চেঁচে ফেলে লবন তাড়াতে হবে। চেঁচে ফেলার ফলে যে মাটি উঠে আসবে সেটা রাস্তায় ফেলে রাস্তা উঁচু করা যাবে। মাটি ধুয়ে ফেলবার সময়ে লবন সহ্য করতে পারে এমন ফসলের চাষ করা উচিৎ।

॥ ক্ষারীয় মাটির সংশোধন ॥

জিপসাম্ (ক্যালশিয়াম্ সালফেট) দিয়ে অধিকাংশ ক্ষারীয় মাটি সংশোধন করা যায়। যেখানে কম বৃষ্টি হয় সেখানেই সাধারণতঃ ক্ষারীয় মাটির ঝামেলা দেখা যায়। খুব ভালোভাবে জল বেরিয়ে যেতে পারে এধরনের দো-আঁশ আর বেলে দো-আঁশ মাটি আর জলে মিশে যেতে পারে সেই পরিমাণের অল্প সোডিয়াম যুক্ত ক্ষারীয় মাটি খুব সহজভাবে সংশোধন করে চাষের কাজে লাগানো যেতে পারে।

ক্ষারীয় মাটিতে জিপসাম লাগাবার আগে জমির জল বের করে দেবার ব্যবস্থাটা জানতে হবে। ভালে ব্যবস্থা থাকলে তবেই জিপসাম ফেলবার কথা চিন্তা করা যাবে। সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা কাজ হবে—মাটি পরীক্ষা করে জেনে নেওয়া জমিতে কতটা জিপসাম দিতে হবে।

মাটিতে যদি অত্যন্ত বেশি পরিমাণে জিপসাম থাকে তবে মাটি ইটের মত শক্ত হয়ে যাবে। এই শক্ত মাটির ভেতর দিয়ে জল সহজে ঢুকতে চায় না। কাজেই দ্রবণীয় লবনসমূহ মাটির ওপরদিকে তার গাছের শিকড়ে জমা হয়। ফলে মাটির ক্ষতিকারক লবনের উপস্থিতিতে বাতাস চলাচল ব্যাহত করে।

ফলে শিকড়ে বাড়তে পারে না। খুব বেশি বাড়াবাড়ি হলে গাছ মরেও যেতে পারে।

জিপসাম দেবার পরই উপযুক্ত সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। ফলে সোডিয়াম ধুয়ে গিয়ে গাছের শিকড়ের নিচে চলে যাবে। ওপরে উঠে আসে ক্যালশিয়াম বা চুন। এটা মাটিকে ঝুরঝুরে করে দেয়। জিপসামকে সাহায্য করার জন্য ধইঞ্চার (সেম্‌বানিয়া এক্যুলিয়েটা) সাহায্যে সবুজ সারের চাষ করা উচিৎ।

॥ যে-কোনো মাটিতেই ফল-ফুল চাষ সম্ভব ॥

চাষের পক্ষে দো-আঁশ মাটি ভালো। বাগানের মাটি দো-আঁশ না হলে তাকে দো-আঁশ করে নেওয়া যায়। বেলে মাটি হলে আপনি মেশাবেন উপযুক্ত পরিমাণে গোবর সার, পাতাপচা সার গোয়ালঘরের আর্বজনা সার, এঁটেল মাটি, কুচুরিপানা, পুকুরের পাঁকমাটি এবং চুন।

এঁটেল মাটিকে দো-আঁশ করবেন পরিমাণমতো গোবরসার পাতাপচা সার, বালি, কাঠ-ঘুটে-তুষ-আবর্জনার যে কোন একটির পোড়ানো ছাই, আর চুন।

এভাবে লেগে থাকলে কয়েক বছরের চেষ্টায় বেলে বা এঁটেল মাটি দো-আঁশ মাটিতে পরিণত হবে। এঁটেল আর বেলে দুধরনের মাটিতে চুন দেওয়া হচ্ছে। কারণ চুনের কাজ দুভাবে হয়। প্রথমতঃ এঁটেল বা জমাট বাঁধা মাটির কণাগুলিকে ছাড়াছাড়ি হতে সাহায্য করবে এবং বেলে মাটির বেলায় বিচ্ছিন্ন মাটি কণাকে ঘন হতে সহায়তা করবে।

॥ চুন ॥

সব ধরনের চাষে—কি মাছ, কি গাছ চুনের অশেষ গুণ। অবশ্য পশ্চিমবঙ্গের সমতল জায়গাগুলির মাটিতে উপযুক্ত পরিমাণে চুন রয়েছে। কিন্তু একই জমিতে বছরের পর বছর ফলফুল চাষ করলে তাতে দু-তিন বছর অন্তর চুন অবশ্যই মেশানো দরকার। তাছাড়া অনেক গাছ আছে যারা সারমাটিতে চুন পছন্দ করে, এদের বেলায় প্রত্যেক বছর অল্প করে চুন মেশানো ভাল। বিভিন্ন ধরনের চুন মাটিতে মেশানো চলে। এদের ভেতর তেজ মরে যাওয়া পাথর চুন গুঁড়ো করে মেশানো সুবিধার। সারমাটিতে পরিমাণ মত চুন না থাকলে ঠিকমত সার নিতে পারে না। চুন দেবেন বর্ষার ঠিক আগে। চুন মেশাতে কিছুটা সাবধান হওয়া উচিৎ। অনেক রাসায়নিক সারের সঙ্গে চুন ঠিক মেশানো চলে না, যেহেতু চুনের সঙ্গে রাসায়নিক পদার্থের কাজ ঘটে অন্য কিছু

(প্রতি ১০০,০০০ ভাগ জলভাগ-এর হিসাবে ব্যক্ত)

লবন	জল নিকাশি মাটির জন্য			খারাপ	নিকাশি মাটির জন্য	
	উত্তম	মোটামুটি	খারাপ	উত্তম	মোটামুটি	খারাপ
মোট দ্রবনীয় খনিজ পদার্থ :	১০০-র কম	১০০-১৫০	১৫০-র বেশি	৭৫-এর কম	৭৫-১০০	১০০-র বেশি
সোডিয়াম কার্বনেট	৮-এর কম	৮-১০	১০-এর বেশি	৫-এর কম	৫-৮	৮-এর বেশি
সোডিয়াম বাই-কার্বনেট	১২-এর কম	১২-১৫	১৫-এর বেশি	৮-এর কম	৮-১২	১২-এর বেশি
সোডিয়াম সালফেট	২০-এর কম	২০-৩০	৩০-এর বেশি	১০-এর কম	১০-১৫	১৫-এর বেশি
সোডিয়াম ক্লোরাইড	৩০-এর কম	৩০-৫০	৫০-এর বেশি	১৫-এর কম	১৫-২০	২০-এর বেশি
ক্যালসিয়াম সোডিয়াম্ অনুপাত (সমতুল)	১-এর বেশি	১	১-এর কম	১-এর বেশি	১	১-এর কম

গড়ে ওঠে, যেটা সারের কাজ না করে গাছের বিষের কাজ করে। তাই চুন দেবেন রাসায়নিক সার দেবার আগে বা পরে এবং বেশ কিছু সময় নিয়ে। আবার অনেক রাসায়নিক সার আছে যেটার ওপর রাসায়নিক সারের সঙ্গে মেশানো চলে না। রাসায়নিক ক্রিয়ায় অন্য কিছু গড়ে ওঠে।

চুনের পরিমাণ ॥ দু-তিন বছর অন্তর একবর্গ মিটার জমিতে ১০০-২০০ গ্রাম চুন দেবেন।

॥ জল ॥

নদী-নালা-বিল-খাল-পুকুর-টিউবঅয়েল-কূপ-করপোরেশনের নলের জল সবকিছু দিয়েই চাষ সম্ভব যদি তাদের মধ্যে অতিরিক্ত মাত্রায় দ্রবণীয় ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ না থাকে। বরং খাল বিলের আর নদীর জলে পলি বা বহতি খনিজ পদার্থ চাষের ব্যাপারে সহায়ক হয়। সমুদ্রের জল দিয়েও চাষ সম্ভব যদি না তার মধ্যে অতিরিক্ত মাত্রায় সোডিয়াম ক্লোরাইড বা খাবার লবন না থাকে। বিখ্যাত সমুদ্র 'ডেড-সী' তে সবকিছুই মৃত।

জলের মধ্যে সাধারণতঃ থাকে—ক্যালশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, সোডিয়াম্, পটাশিয়াম্ সালফেট, ক্লোরাইট, কার্বনেট, বাইকার্বনেট, নাইট্রেট। কোন কোন জলের মধ্যে গন্ধক, লোহা, কোথাও কোথাও বোরণ, ফ্লুবাইড্ম, সেলেনিয়াম ইত্যাদিও থাকতে পারে। কোন খনিজ পদার্থ জলের মধ্যে থাকলেই জল খারাপ হবে না, খারাপ হবে খনিজের অতিরিক্ত উপস্থিতির জন্য। ২৯ পৃঃ সারণীতে দেখানো হয়েছে খনিজ পদার্থ কতটা পরিমাণ থাকলে জল দূষিত হতে পারে।

॥. কত ধরনের ফল-ফুল বাগানে সেচ করা যায় এবং তার সুবিধা ও অসুবিধা ॥

ক. **প্লাবন পদ্ধতি ॥** এই নিয়মে জল বাগান বা জমিখণ্ডকে পুরোপুরিভাবে জলে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। এটা খারাপ নিয়ম। কারণ এভাবে সেচ দিলে শতকরা মাত্র ২০ ভাগ জল গাছের গোড়ায় যায়, বড় অংশটাই নষ্ট হয় জলের গড়ানো, চোঁয়ানো আর বাষ্পীভবনের ফলে উবে যাওয়ার দরুণ। ফলে ফসল ভাল হয় না। জমি অসমান হবে আর সেচের ব্যবস্থা বিনামূল্যে হলে অবশ্য এ ব্যবস্থা চলতে পারে।

কিন্তু জমির জলবসা দোষ থাকলে এ পদ্ধতি একেবারে অচল।

খ. **খণ্ড জমির পদ্ধতি** ॥ এই নিয়মে সমস্ত জমি ১৫-৩০ সেমিঃ উঁচু আল দিয়ে জল দেওয়া হয়। জমি খণ্ডটির দৈর্ঘ হবে ৩০ মিটার যদি মাটি দো-আঁশ হয়। ৯০ মিটার হবে লম্বায় যদি মাটি এঁটেল হয়। জল দুষ্প্রাপ্য হলে এবং দামি ফল-ফুল হলে জমি খণ্ডের আয়তন আরও ছোটো করা উচিৎ।

গ. **পর্যঙ্ক পদ্ধতি** ॥ ফল-ফুল বাগানের পক্ষে এই পদ্ধতি সবচেয়ে ভালো। জমির খণ্ডগুলি এখানে বর্গাকার-আয়তকার অথবা গোল হতে হবে। খুব বড় ফল-ফুল গাছ হলে গাছকে বেড় দিয়ে গোল করে নালা কেটে নেওয়া উচিৎ। ফলে গোড়ার মাটি শুকনো থাকবে। ঐ নালার বাঁধের উচ্চতা কতটা হবে সেটা নির্ভর করে কতটা পরিমাণে জল দেওয়া হবে তার ওপর।

ঘ. **খাত পদ্ধতি** ॥ এই নিয়মে সমস্ত জমিকে ঘিরে বড় বড় নালার ভাগ করা হয়। নালা চওড়ায় একফুট। সমস্ত জমি জুড়ে নালা কাটা থাকবে। সাধারণতঃ মাটির ভেতরে জল ঢোকার ক্ষমতার ওপর নালার দৈর্ঘ নির্ভর করে। এর তারতম্য ৩-৬ মিটার পর্যন্ত হতে পারে। বালি এবং, বালি দো-আঁশ মাটিতে নালার দৈর্ঘ হবে কম। এঁটেল মেটেল মাটিতে দৈর্ঘ হবে বেশি।

॥ আন্তর্ভূমির সেচ ॥

আন্তর্ভূমির সেচ অর্থাৎ মাটির নিচের সেচ দু'ধরনের হতে পারে। প্রাকৃতিক অথবা কৃত্রিম। প্রাকৃতিক আন্তর্ভূমির সেচ সেখানেই সম্ভব যেখানে শিকড় বলয়ের নিচে একটি অপ্রবেশ্য-স্তর থাকে। অপ্রবেশ্য-স্তর পর্যন্ত খুঁড়ে কতগুলি গর্ত করা হয় এবং তাতে জল বোঝাই করা হয়। ফলে পাশের শিকড়বলয়ে গিয়ে মাটিকে দেয় ভিজিয়ে। কৃত্রিম অন্তর্ভূমির সেচ মাটির বলয়ের নিচে ভূগর্ভ ছিদ্র করা অথবা ফুটোওলা চোঙ্ বসানো হয় এবং উপযুক্ত ব্যবস্থার দ্বারা চোঙের মাঝ দিয়ে জল দেওয়া হয়। উভয় ক্ষেত্রেই জলপীঠ উপরে তোলাই উদ্দেশ্য—যাতে গাছের শিকড়গুলি কৈশিক চলনের দ্বারা জল পেতে পারে। প্রথমদিকে খরচ বেশি হলেও পরের দিকে খরচ কম লাগবে রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে। এই পদ্ধতিতে বাষ্পীভবনের ভয় শূন্য।

আন্তর্ভূমির সেচ ব্যবস্থায় মাটি ক্ষার এবং লবনভাব বেড়ে যেতে পারে।

॥ ফল-ফুল বাগানে জলের পরিমাণ ॥

মাটিকে কতটা ভেজাবেন সেটা নির্ভর করবে মাটির গ্রহণ অর্থাৎ মাটিতে কি কি আছে সেটার ওপর। গড়ে বালিমাটিকে ৩০ সেমিঃ গভীরে ভেজাতে

জলের প্রয়োজন ১·২৫ সেমি, বালি দো-আঁশের জন্য ২·৫ সেমিঃ, শুধু দো-আঁশের জন্য ৫ সেমিঃ, মেটেল মাটি পিছু ৬.২৫ সেমিঃ এবং এঁটেল মাটির জন্য দরকার ৭.৫ সেমিঃ। মাটিতে সেচের প্রয়োজন তখনই হবে যখন প্রায় $\frac{2}{3}$ অংশ (৬৬%) জল গাছ ব্যবহার করে। দো-আঁশ মাটিতে ৩০ সেমিঃ গভীরতা পর্যন্ত মাটিকে ভিজিয়ে রাখার জন্য প্রতি সেচে ৩·৩৩ সেমিঃ জল দিতে হবে।

কতদিন অন্তর অন্তর জল দিতে হবে—সেটা নির্ভর করে কি ধরনের ফলফুল চাষ হচ্ছে তার ওপরে এবং কি ধরনের মাটি তার ওপর।

মাটির আর্দ্রতা বা ভিজা থাকা ভাবের ওপরে জল দেওয়ার অন্তর এবং কতটা জল দেবেন সেটা নির্ভর করে।

॥ কিভাবে মাটির আর্দ্রতা মাপবেন ॥

যে মাঠ বা বাগানের আর্দ্রতা মাপবেন সেই জমি থেকে কিছু মাটি নল বা তুরপুনের সাহায্য তুলে নিন। এরপরই ঐ মাটিকে উনুনের মধ্যে ১০৫°-১১০° সেন্টিগ্রেডে শুকিয়ে নিতে হবে। মাটি শুকানোর ফলে জলের ক্ষতির পরিমাণ মাটির শুকনো ওজনের ওপর শতকরা হিসেবে অথবা ঘনফলের ভিত্তিতে হেক্টর/সেমিঃ (সেন্টিমিটারে) দেখান যায়।

॥ চাষের জমির জল নিকাশ ॥

ফুল-ফল বাগানে জল দরকার অবশ্যই। প্রথমে মাটি তারপর জল। তাই বলে মাঠের জমিতে অদরকারে জল যেন প্যাচ প্যাচ না করে। আবার অনাবশ্যকভাবে কোথাও জল চুইয়ে জমা হয়ে জলবসা রোগের সৃষ্টি না করে। হিতের থেকে জলবসা অবস্থায় অহিতই বেশি করবে। সেচ আর জল নিকাশ দুজনেই ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যেন রাত্রি আর দিন। সেচ যেমন গাছের গোড়া বা শিকড় ভেজায়, জল নিকাশ আবার অতিরিক্ত জলকে তাড়িয়ে দেয়, যাতে জল বেশি মাত্রায় গিয়ে শিকড়কে না পচিয়ে দেয়।

জল নিকাশ দুভাবে হয়, (১) মাঠ বা বাগানের ওপরকার জল নালা কেটে বের করে দিয়ে, (২) মাটিতে জল চোঁয়ানোর ফলে মাটির নিচে যে জল জমা হয় সেই জলকে বের করে দেওয়াকে বলা হয় চোঁয়ানি নালা।

মাঠের বা বাগানের ওপরকার জল নালা কেটে সহজে বের করে দিতে হবে যাতে জল না জমে যায়।

কিন্তু মাটির নিচে কোথায় জল জমছে সেটা জানা সাধারণ মানুষের পক্ষে কঠিন হলেও ভূ-বারি বৈজ্ঞানিকের পক্ষে কোনো সমস্যাই নয়। যদি বোঝা

যায় মাঠের ঠিক কোনো জায়গায় জল জমছে, তবে মাটি কেটে গর্ত করে সেই জমা জলকে মাটির আরও নিচে বইয়ে দেবার জন্য জমা জল থেকে নিচে নালি কেটে বা পাইপ বসিয়ে অনেক নিচে নামিয়ে দিতে হবে। চোঁয়ানি নালার জন্য খোলা নালি, টালি এবং চোঙ্ ব্যবহার করা যেতে পারে। অনেক জায়গায় টালি বসানো হচ্ছে। কারণ ধাপে ধাপে টালি বসিয়ে চোঁয়ানি নালার খরচ কম করা যায়।

॥ গাছের খাবার বা সার ॥

গাছের ব্যাপারে অহেতুক একটা প্রশংসা দিয়ে থাকি,—গাছ তার খাবার নিজেই বানিয়ে থাকে। মানুষও তার খাবার রান্নাঘরে বসে বানায়। তবে গাছের একটা সুবিধে আছে, যা মানুষের নেই। গাছ তার মাটির তলায় শিকড় আর তার শাখা-প্রশাখা বাড়িয়ে খাবার তৈরি করে নেয়। একাজটা মানুষ কিছুতেই করতে পারবে না যদি রান্নাঘরে কাঁচামালের অর্থাৎ চাল-ডাল-তরিতরকারির অভাব হয়, এবং আগুন না থাকে। আবার গাছকে যে-কোনো মাটিতে বসিয়ে দিলেই যদি সে তার খাবার বানিয়ে নিতে পারত তবে জগৎ জুড়ে 'সার সার' বলে আর্তনাদ উঠতো না। ভারতও উন্নত দেশগুলির মত সর্বত্র গম ভুট্টা ফলাতো। তাই দেখা যায়, একই জমিতে যেখানে সার পড়েছে সেখানকার ফসল খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে যাচ্ছে আর যেখানে সারের গন্ধ নেই সেখানকার গাছপালা ঝিমুচ্ছে। সারকে উর্বরকও বলা হয় যেহেতু সার জমির উর্বরা শক্তিকে বাড়িয়ে দেয়।

গাছ তার খাবার পায় বাতাস আর মাটি থেকে। কার্বন পাচ্ছে বাতাসের কার্বনডাই-অক্সাইড থেকে, অক্সিজেন বাতাস এবং জল থেকে, হাইড্রোজেনও জল থেকে, নাইট্রোজেন বাতাস অথবা মাটি এবং অন্যান্য সমস্ত খাদ্যগুণ বা পোষক মাটি থেকে। মাটিই গাছের প্রধান ঘাঁটি।

মুখ্য-পোষক বা খাদ্য ॥ নাইট্রোজেন-ফসফোরাস-পটাশিয়াম।

গৌণ পোষক বা খাদ্য ॥ ক্যালশিয়াম্-ম্যাগনেশিয়াম্-গন্ধক।

অণুপোষক অথবা নামমাত্র গাছে লাগে,—লোহা, ম্যাংগানিজ, তামা, দস্তা, বোরণ, মলিব্ডিনাম্ এবং ক্লোরিন। না, গাছে ভিটামিন বা খাদ্যগুণের কোনো দরকার হয় না। বরং সবধরণের ভিটামিন মোটামুটি উদ্ভিদ বা গাছ থেকে পাওয়া যায়।

গাছের খাবার বা সারকে দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে, (ক) স্বাভাবিক,

—মাটি আর বাতাস থেকে যা আসছে। এটাকে প্রাকৃতিক খাবারও বলা যায়। (খ) কৃত্রিম বা রাসায়নিক সার যেটা সম্পূর্ণভাবে মানুষ তৈরি করে দিচ্ছে গাছের খাবারের ঘাটতি মেটাবার জন্য। স্বাভাবিক হোক আর কৃত্রিম হোক সব শেয়ালের এক 'রা'-র মতো সমস্ত ধরণের সারের মধ্যে আছে সেই নাইট্রোজেন-ফস্‌ফোরাস্‌-পটাশিয়াম-ক্যালশিয়াম প্রভৃতি।

এবার খুব সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক, গাছের মুখ্য-গৌণ আর অণুপোষক বা খাদ্য গুণগুলি কি কি কাজ করে—

নাইট্রোজেন॥ গাছের ডাল-পালা বাড়িয়ে দেয়। পাতার সবুজ রং আনে। গাছে যথাযথ নাইট্রোজেন থাকলে ফসফোরাস এবং পটাশিয়ামের কাজ সুন্দর হয়।

নাইট্রোজেনের অভাবে গাছের বাড় এবং শিকড়ের উন্নতি সম্ভব নয়। ফলে পাতার রং হয়ে যায় হলদে বা ফিকে সবুজ। ফল-ফুল খুব তাড়াতাড়ি পেকে যায় বা পরিণতি লাভ করে। ফলের দানা ছোট হয়ে আসে, ফুলের রং খোলে না বা ফুল বড় হয় না। গাছের পুরানো পাতাই অভাবজনিত রোগের প্রথম আর প্রধান শিকার হয়।

নাইট্রোজেন বেশি পড়লে কখনো কখনো পাতা চামড়ার মতো কুঁচকে যায়। হয়ে যায় ঘন সবুজ এবং রসালো। ফল ভালো হয় না আর রোগের সম্ভাবনা দেয় বাড়িয়ে।

ফসফোরাস্‌॥ গাছের প্রাণশক্তি বাড়ায়, ফল-ফুল ভালো হয়, নতুন কোষ গড়ে। শিকড়, বিশেষ করে গুচ্ছমূলের ছড়িয়ে পড়ায় সাহায্যে আসে। ফসফোরাস্‌ ফুল-ফলের উৎকর্ষ বাড়ায় এবং গাছের ফুল ধরায় অনেকদিন ধরে। ফসফোরাস্‌ বেশি হলে গাছের ক্ষতি হয় না। বরং এই সার দিয়ে নাইট্রোজেন বেশি হলে তার প্রভাব কমানো যায়।

পটাশিয়াম॥ ফল-ফুলের গাছের রোগ-প্রতিরোধ-ক্ষমতা, কীট-পোকার আক্রমণ, ঠাণ্ডা এবং অন্যান্য প্রতিকূল অবস্থার প্রতিরোধে গাছকে সাহায্য করে। শ্বেতসার তথা শর্করা গঠনে এবং পরিবহনে পটাশিয়াম সাক্ষাৎ কাজে আসে। ফলের ব্যাপারে পটাশিয়ামের ভূমিকা অপরিসীম। কারণ যে-কোনো ফলেরই আমরা শ্বেতসার পাই। এই মৌলটি বেশি হলে নাইট্রোজেনের মত গাছের ক্ষতি করে না, তবে ফল পাকতে দেরি হয়।

ক্যালশিয়াম॥ গাছের পেকটিনের সঙ্গে মিলে ক্যালশিয়াম পেক্‌টেট্‌

গঠন করে, যেটি আবার গাছের কোষের দেওয়ালের অপরিহার্য উপাদান। গাছের নাইট্রোজেন পাওয়ার জন্য মাটির নিচেকার জীবাণুদের কাজ বাড়িয়ে দেয়। শিকড় বাড়াতে সাহায্য করে।

ক্যালশিয়াম কম হলে গাছের শিকড় ডগার দিকে যায় শুকিয়ে। অথবা খাটো বা মোটা হয়। ক্যালশিয়াম খুব বেশি বা কম হলে পাতায় ছোপ-ছোপ দাগ পড়ে।

ম্যাগনেশিয়াম ॥ গাছকে, বিশেষ করে পাতাকে সবুজ রাখা এর প্রধান কাজ। গাছের তেল গঠনেও এই মৌল কাজে আসে। খুবই কম লাগে বলে এর অভাবও টের পাওয়া যায় না। কিন্তু একেবারে ম্যাগনেশিয়াম-শূন্য হলে গাছে তার লক্ষণ সুস্পষ্ট,—পাতা হলুদ হয়ে যাবে। অসময়ে যাবে পাতা ঝরে, আপেল গাছে পাতার ওপর বাদামি ছোপ আসবে। ক্যালশিয়াম ম্যাগেনেশিয়াম এবং ম্যাগেনেশিয়াম পটাশিয়াম্ সব সময় হাত ধরাধরি করে চলে।

গন্ধক ॥ চীনাবাদাম-ছোলা-রসুন-বাঁধাকপি-মূলো প্রভৃতি গাছে গন্ধক লাগে এবং জমিতে গন্ধক থাকলে ঐ সব গাছ ভাল জন্মায়।

লোহা ॥ লোহার অভাবে গাছের কচি পাতায় পাণ্ডুরোগ দেখা দেয় অথচ শিরাগুলি ঠিক সবুজ থেকে যায়।

ম্যাংগানিজ ॥ এর অভাবে জালি শিরার পাতার আন্তঃশিরায় এবং কলায় পাণ্ডুরোগ এবং শিরা সামন্তরাল হলে পাতায় সাধারণ পাণ্ডুরোগ দেখা যায়।

তামা ॥ গাছে এত কম লাগে যে এককভাবে এর অভাব ধরা বেশ কঠিন। কারণ এর কাজ অন্যান্য অণুপোষকের সঙ্গে। তবে এর অভাবে গাছের ছালের নিচে থলি, ফল ফেটে যাওয়া, কাণ্ডের ডগা শুকনো, পাণ্ডুরোগ, একাধিক মুকুল, পাতার বিকৃতি।

দস্তা ॥ এর অভাবে পাতার নিচে বিশেষ করে গাছের নিচেকার পাতার শিরায় আন্তঃশিরা পাণ্ডুরোগ হতে দেখা যায়।

সোডিয়াম্ ॥ ফলফুলে অতি আবশ্যকীয় মৌল নয়। তবে পটাশিয়ামের অভাব থাকলে সোডিয়াম খুব কাজে আসে।

বোরণ ॥ এর অভাবে ফলের শোলার ছিপির আকার এবং ফুলের রং ব্রোঞ্জের মত হয়। আপেল গাছের ডগা যায় শুকিয়ে।

মলিবডেনাম ।। এর অভাবে নাইট্রোজেন সংযোগকারী জীবাণুদের কার্যক্ষমতা যায় কমে।

॥ পাতা সার ॥

গাছের পাতায় খাবার স্প্রে করে বা ছিটিয়ে দিলে পাতার মারফৎ গাছ খুব তাড়াতাড়ি সে খাবার নিতে পারে। গাছের পাতায় সার দেওয়া হয় দু-ধরণের—

১. রাসায়নিক মুখ্য পোষক খাবারগুলি অর্থাৎ নাইট্রোজেন-ফসফোরাস্-পটাশিয়াম-ক্যালসিয়াম প্রভৃতি।

২. অণুপোষক সার বা ট্রেস্এলিমেণ্টস্, যথা, বোরণ, লোহা, ম্যাংগানিজ, মলিবডেনাম প্রভৃতি।

পাতায় সার স্প্রে বা ছিটানোর আগে পাতার দুপাশে পরিষ্কার জল বা ১% ভিম-পাউডার জলের মিশ্রনে ভাল করে ধুয়ে নিতে হবে।

পাতায় পাতা সার ছিটানোর আগে কতগুলি ব্যাপারে লক্ষ্য রাখতে হবে, (১) গাছে কি ধরনের সার কতটা লাগবে। (২) ওপরে বলা দুধরনের সার এক সঙ্গে দেবেন না। (৩) সকাল আটটা নাগাদ ছিটাতে হবে। (৪) প্রথম পাতা সারটি অর্থাৎ মুখ্য পোষক সার দেবেন দশদিন অন্তর। আর অণুপোষক সার দেবেন একমাস বা দুমাস অন্তর। (৫) পাতার সার ব্যবহার করা উচিৎ শীতকালে। (৬) পাতাসার স্প্রে করার আগে খেয়াল রাখতে হবে যাতে পাতার দুদিকেই সার লাগে। (৭) পাতার সার যাতে ফুলে না পড়ে খেয়াল রাখতে হবে—ফুলে দাগ লাগতে পারে।

॥ জমিতে কতটা খাবার বা সার দিতে হবে ॥

আগেই বলা হয়েছে ফল-ফুল বাগানে সার প্রয়োগ করার আগে জমির মাটি পরীক্ষা করে জেনে নেওয়া দরকার, কি কি সার কত পরিমাণে লাগবে। অনুমোদিত হারে নাইট্রোজেন ফসফোরিক অ্যাসিড অথবা পটাসের প্রয়োগের

হিসাবে রাসায়নিক সারের পরিমাণ বের করার জন্য, অথবা বিপরীতভাবে নিচের পরিবর্তন গুণক ব্যবহার করা যেতে পারে।

পরিমাণ	গুণ করে	পাওয়া যায় অনুরূপ পরিমাণের
নাইট্রোজেন	৪.৮৫৪	এমোনিয়াম সালফেট
ঐ	২.২২২	ইউরিয়া
ঐ	৩.৮৪৬	এমোনিয়াম্ সালফেট নাইট্রেট্
ঐ	৪.০০০	এমোনিয়াম ক্লোরাইড্
ঐ	৩.০৩০	এমোনিয়াম নাইট্রেট্
ফসফোরিক এসিড (P_2O_5)	৬.২৫০	সুপার ফসফেট, সিংগল
ঐ ঐ	২.২২২	সুপার ফসফেট, ডবল
ঐ ঐ	২.৮৫৭	ডাই ক্যালশিয়াম্ ফসফেট
ঐ ঐ	৫.০০০	হাড়গুঁড়া, কাঁচা
পটাস (K_2O)	১.০০০	মুরিয়েট অফ্ পটাশ
ঐ ঐ	২.০০০	সালফেট অফ্ পটাশ
এমোনিয়াম সালফেট	০.২০৬	নাইট্রোজেন
সোডিয়াম নাইট্রেট	০.১৫৫	ঐ
ইউরিয়া	০.৪৫৭	ঐ
এমোনিয়াম সালফেট নাইট্রেট	০.২৬০	ঐ
এমোনিয়াম ক্লোরাইড	০.২৫০	ঐ
এমোনিয়াম নাইট্রেট	০.৩৩০	ঐ
সুপার ফসফেট্ সিংগল	০.১৬০	ফসফোরিক এসিড (P_2O_5)
ঐ ডবল	০.৪৫০	ঐ ঐ
ডাই ক্যালসিয়াম ফসফেট	০.৩৫০	ঐ ঐ
হাড়গুঁড়া, কাঁচা	০.২০০	ঐ ঐ
মুরিয়েট অফ্ পটাশ	০.৬০০	পটাশ
সালফেট অফ্ পটাশ	০.৫০০	পটাশ

॥ বাগান তৈরির আগে অল্প-খরচার সার ॥

(১) **খামারের আবর্জনা সার ॥** ভারতে সবচেয়ে বেশি এই সার ব্যবহার করা হয়। এতে আছে—গোবর, গবাদি-পশুর শোবার জন্য ব্যবহার

করা বিচুলি-খড়, গবাদি পশুর খেতে গিয়ে ফেলে দেওয়া খাবার (বিচুলি বা খড়-ই যাতে বেশি), কাঁচা ঘাস-পাতা প্রভৃতি।

(২) **কম্পোস্ট সার** ॥ কম্পোস্ট সার তৈরি করবেন :

খামারের মিশ্র আবর্জনা এবং গোয়ালের আবর্জনা	—	৪০০ ভাগ
প্রস্রার বা চোনায় ভেজানো আবর্জনা	—	৫৬ "
তাজা গোবর	—	৬০ "
কাঠের ছাই	—	৬ "

এর সঙ্গে মেশাতে হবে টন প্রতি ৫০ পাউণ্ড বা ২০ কেজি হাড়ের গুঁড়া এবং ৮০ কেজি কিছুটা গাঁজানো গোবর।

(৩) **টাউন কম্পোস্ট** ॥ শহর থেকে দূরে বয়ে যাওয়া আবর্জনা। মল-মূত্র, জল এবং মাটি পর পর স্তর দিয়ে ভর্তি করা হয়। প্রায় তিন মাসের মধ্যে কম্পোস্ট তৈরি হয়ে যায়। সবচেয়ে ভাল সার।

ঢাকা দেওয়া অবস্থায় পচানো গবাদি পশু, শূকর প্রভৃতির মল, ফলফুল বাগানের উত্তম সার।

(৪) **সবুজ সার** ॥ চাষের কাজে সরচেয়ে বেশি সবুজ সার ব্যবহার করা হয়। আগের বলা সারগুলি সব সময় দেওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু সবুজ সার দেওয়া কিছু মাত্র কঠিন নয়। জমিতে নাইট্রোজেন লাগাতে সবচেয়ে বেশি শুঁটি জাতীয় ফসলের চাষ করা হয়। শুঁটি জাতীয় ফসল একরে ৩-১০ টন সবুজ পদার্থ উৎপাদন করলে সেটাই যদি মাটিতে চাষ দেওয়া যায় তবে ২৪-৮০ পাউণ্ড নাইট্রোজেন যোগ হবে।

॥ ফল-ফুল চাষে ও বংশবিস্তারে বীজ, কলম প্রভৃতি ॥

বীজ দ্বারা সাধারণতঃ গাছ বংশবিস্তার করে। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, যে-বীজ শুকনো, খটখটে তার ভিতরে আছে প্রাণশক্তি। পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধের আস্বাদন সেও পেতে চায়। সবাই পায় না। কারণ অনেক বীজের ভেতরে ভ্রূণ বা প্রাণশক্তি নষ্ট হয়ে যায়। তাই বীজ জমিতে লাগাবার আগে বীজ চ্যাটান ডিসে (পেট্রি ডিসে) পরীক্ষা করে নেওয়া উচিৎ। যদি ১০০টি বীজের মধ্যে ৮০-৯০টি বা তার বেশি সংখ্যার বীজে অঙ্কুরোদ্গম হয়, সে বীজ চাষের পক্ষে উপযোগী।

পেট্রিডিসের ভেতরে ফিল্টার পেপার বিছিয়ে তার ওপর বীজ এবং পরে

জল দিয়ে ডুবিয়ে দিতে হবে। যেসব বীজ পোকায় খাওয়া, জলে ভেসে ওঠে, সেগুলির অঙ্কুরোদ্গম সম্ভব নয়।

॥ ফল-ফুল চাষে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয় কলম ॥

সবধরনের কলমই গাছের অঙ্গজননের অন্তর্গত। কলম করা হয়,—(ক) শাখাকলম, (খ) দাবাকলম, (গ) চোককলম ও (ঘ) গুঁধু কলম।

(ক) **শাখা-কলম ॥** এই পদ্ধতিতে বংশবিস্তার হয়। গাছের কাণ্ড বা শাখা, মূল বা শিকড় বা পাতা থেকে একটি অংশ কেটে নিয়ে আবার লাগান। কাণ্ডের শাখা-কলম সাধারণতঃ ৮-১০ ইঞ্চি লম্বা হয় এবং ঐ খণ্ডঅংশে থাকে কয়েকটি পর্ব। শিকড় বের করার জন্য কাটা অংশটির ১-২টি পর্ব নিয়ে মাটিতে পুঁতে দিতে হবে। মাটির ওপরের পর্ব থেকে মুকুল বের হয় এবং এই মুকুল পরে জন্ম দেয় বিটপ। উষ্ণ এবং আর্দ্র মাটিতে শাখা-কলম পুঁততে হবে। প্রচণ্ড সূর্যের তাপ, বা অত্যন্ত গরম আবহাওয়ার শুকনো ভাবের জন্য শাখা-কলমের শুকিয়ে যাওয়ার প্রচুর সম্ভাবনা।

সবুজ কোমল অংশ বা শক্ত কাষ্ঠময় অংশ থেকে শাখা-কলম সংগ্রহ করতে হবে। সতেজ কোমল অংশ থেকে সহজেই শিকড় বের হয়। শক্ত অংশ থেকে শিকড় বের করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

(খ) **দাবা-কলম ॥** কোন গাছের শাখাকে বাঁকিয়ে মাটির ভেতর প্রবেশ করানোর পদ্ধতিকে দাবা-কলম বলে। বাঁকানো অংশ থেকে অস্থানিক মূল বা ঝুলনো শিকড় বের হয়। শিকড় বের হবার পর দাবা-কলমকে মূল বা মাতৃ উদ্ভিদ থেকে আলাদা করে নেওয়া হয়। পরে এই কাটা অংশ জমিতে লাগালে নতুনভাবে গাছ তৈরি হয়।

দাবা-কলমের শিকড় তাড়াতাড়ি বের করবার জন্য মাটির ভেতর যে অংশ ঢুকিয়ে দেওয়া হয় তার একটি পর্বে জিভের আকারে একটা অংশ অথবা এক ইঞ্চি পরিমাণ ছাল মুড়ে তুলে ফেলতে হবে।

(গ) **চোক-কলম ॥** কোনো গাছের অপরিণত বা অব্যক্ত মুকুল তুলে অপর গাছের কাণ্ডের বা শাখার ছালের সঙ্গে সামান্য ফাঁক করার পর সেই অব্যক্ত মুকুল ঢুকিয়ে দেওয়াকে বলে চোক-কলম পদ্ধতি। ব্যবসায়ের গোলাপে এই পদ্ধতি সবচেয়ে বেশি খাটানো হয়। যে গাছ থেকে মুকুল তোলা হলো সেটা হলো সাইয়ন (Scion) এবং যে গাছে মুকুল ঢুকিয়ে দেওয়া হল সেটি হবে স্টক। সাধারণতঃ বুনো বা আপাংক্তেয় গাছ, যে শুধু খাবার আর

আশ্রয় জোগাবে, স্টকের কাজ করে। চোক-কলমকে অনেকে শিল্ড বাডিং বলে। তবে ষ্টক এবং সিরণ একই পরিবার বা ফ্যামেলির হওয়া চাই।

যে শাখা থেকে মুকুল নেওয়া হবে এবং যে শাখায় মুকুল লাগানো হবে—দুটিরই কম বয়স হওয়া উচিৎ, এবং দুটিই হবে চলতি ঋতুতে উৎপন্ন হওয়া শাখা। হেরফের হলেই চোক-কলম ব্যর্থ হবে। নির্বাচিত মুকুলটি ঢাল বা শিল্ডের মতো আকৃতিবিশিষ্ট ছাল সমেত তুলতে হবে। মুকুলের সঙ্গে কিছু কাঠ উঠে আসাও উচিৎ। পরে ঐ কাঠ ছাড়িয়ে নিয়ে ফেলে দিতে হবে। যে পাতার কোণে মুকুলটি জন্মায় তার বোঁটার কিছু অংশ মুকুলের সঙ্গে রাখতে হবে। স্টকে বা বুনো গাছে (অবশ্যই গোলাপ) তীক্ষ্ণ ছুরির সাহায্যে একটি 'T' চিহ্ন এঁকে ঐ জায়গার ছাল আলগা করে মুকুলটি তার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে মুকুলের মুখটি বাইরে রেখে খুব তাড়াতাড়ি কলা গাছের ফেঁসা বা পলিথিনের ফিতে দিয়ে বেঁধে দিতে হবে। কয়েক সপ্তাহ পরে মুকুলটি বসে গিয়ে পাতা সৃষ্টি করলে পলিথিনের বাঁধন খুলে দিতে হবে।

(ঘ) **কলম** ॥ একটি গাছের (সায়ন) শাখা-প্রশাখার ছোট অংশ অপর একটি গাছের (স্টক) শাখা-প্রশাখায় বসিয়ে দেওয়াকে কলম বলে। কলমেও সায়ন ও স্টকের সম্বন্ধ চোক-কলমের মতো। চোখ-কলম কেবল মাত্র গাছের নরম শাখা-প্রশাখায় হয় (আকাষ্ঠল অংশ)। কলম গাছের কাষ্ঠল অংশেই শুধু সম্ভব। চার ধরনের কলম আছে—(১) গোঁজ-কলম, (২) জিব-কলম, (৩) গদি-কলম, (৪) গুঁড়ি-কলম।

প্রথম তিনটিতে সাইয়ন এবং স্টকের বয়স ও বেধ বা চওড়া কাছাকাছি হওয়া দরকার। কিন্তু গুঁড়ি-কলমে সাইয়ন ও স্টকের বয়স ও বেধ বিভিন্ন হলেও চলবে।

জিভ-কলমে স্টকে ২-৩ ইঞ্চি লম্বা 'দ'-আকারের খাঁজ কাটতে হবে। সাইয়নে ঠিক ঐ ভাবে কিন্তু বিপরীতমুখো খাঁজ কাটতে হবে। উদ্দেশ্য হলো যাতে ঐ দুই খাঁজ পরস্পরের সঙ্গে পুরোপুরি মিলে যায়। মিলনের জায়গায় মস্ বা কাদা দিয়ে লেপে শক্ত করে পাট বা শন দিয়ে বেঁধে দিতে হবে। অথবা জায়গাটায় মোম লাগানো কাপড় বা পলিথিন ফিতে ব্যবহার করা যায়। সায়নের মুকুলগুলি থেকে ৬-৮ ইঞ্চি শাখা বের হলে ঐ আবরণ সরিয়ে দিতে হবে।

॥ পৃথিবীর তথা ভারতের তথা পশ্চিমবঙ্গের বিখ্যাত ফল-ফুলের এবং ঐ সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান ॥

একমাত্র রজনীগন্ধা ছাড়া অন্য সব ফুলের চাষ ব্যবসায়িক ভিত্তিতে করতে হলে অবশ্যই আপনাকে বিদেশের সাহায্য নিতে হবে। বিদেশে ফুল, পাতাবাহার প্রভৃতি পাঠাতে হলে অবশ্যই আপনাকে ভাল জিনিস পাঠাতে হবে। আর সত্যি কথা বলতে কি, ক্যাকটাস্-অর্কিড ছাড়া সব ফুলের চারা কলম, ভাল ফলের বীজ, খুবই উন্নত খাবার—সার, ওষুধপত্তর বিদেশ থেকে আনতে হবে। আপনার পরের কাজ হবে বিদেশ থেকে আনা ফুল গাছের উন্নত প্রজাতি সৃষ্টি করা। আজ ভারতে তথা পশ্চিমবঙ্গের বিখ্যাত ফলফুলের প্রতিষ্ঠান-গুলি এভাবেই বড় হয়েছে।

ক্যাকটাস্-অর্কিডের বেলায় অনেকে প্রথমে চারা গাছের চাবিকাঠিটি বিদেশ থেকে আনায়। যদিও আমাদের পাহাড়-পর্বতগুলিতে বিশেষ করে দার্জিলিং-সিকিমে অজানা সুন্দর সুন্দর অর্কিড-ক্যাকটাস রয়েছে।

গোলাপ-গ্লাডিওলাস-ডালিয়া-চন্দ্রমল্লিকা প্রভৃতি ফুলগাছের ব্যবসায়ে নামতে হলে অবশ্যই আপনাকে বিদেশের মুখাপেক্ষী হতে হবে।

ফলের বেলায় বিদেশ থেকে অবশ্যই আপনি চারা-বীজ-কার্টিং কলম আনছেন না। আর আনলেও খুব একটা সুবিধা হবে না। উন্নত মানের প্রজাতি ফলের বেলায় আপনাকে নিজেকেই সৃষ্টি করে নিতে হবে।

নিচে কিছু বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানের নাম ঠিকানা দিলাম। যতই অপ্রাসঙ্গিক হোক, চিঠির উত্তর ওঁরা দেবেন। এটা আমার ব্যক্তিগত ধারণা নয়, অভিজ্ঞতা।

১.	বীজ বাইরে থেকে আনতে হলে,	W. At lee Burpee Co. Wermin-ster, PA 18974,
২.	চারা বীজ, কাটিং প্রভৃতি আনতে হলে,	Sunnyslope Gardens, San Gabriel, California.
৩.	ঐ	H. Woolman, England.
৪.	ঐ জার্মানি থেকে,	Dietmar Bosse, Gartenstrasse, 28, 7135 Wiemsheim 4 Tel : 070 44/5888
৫.	ঐ ঐ	Friedrich Pieschel Nr. 162 2840 Diepholz 2 (Asher) Tel : 05441/2598

৬.	চারা বীজ, কাটিং প্রভৃতি		Curt Hanbitz & Co. Kirchweg 54, 160 Berlin-38 Tel : 030/8035546
৭.	ঐ	ঐ	Hans Peter Zimmermann Zum Rosengarten 12 6551 Weinsheim, Tel : 06758/ 6651
৮.	ঐ	ঐ	H. Walder A G. Postfach 8038 Zurich, Tel : 014822 130
৯.	ঐ	ঐ	W. Weibull A B Box 520 26124 Landskrona, Tel : 418/78000
১০.	ঐ	ঐ	Chr. Hannestad A/S 1601 Fredrikstad, Tel : 12269
১১.	ঐ	ফিনল্যাণ্ড	Jali Lyyvaraoy, Mullintic 9 20300 Turku 30 Tel : 821383300
১২.	ঐ	ইংলণ্ড	Asmer Seeds Limited, Asmer House, ASH Street, Leister, LE 50 DD
১৩.	ঐ	হল্যাণ্ড	Anton Nijssen and Zonen, N.V. Santport, Holand.
১৪.	ঐ	ভারত	Indo-American Hybrid Seeds, 42/1 Yadiyur, K.K. Road. Banshankar, II Stage, Bangalore 560070
১৫.	ঐ	ঐ	Poocha Seeds Pvt. Ltd. (For Flowers). Near Sholapur Bazar, Pune—411001

১৬. ঐ ভারত	Navalakha Agency, Krishi Bhavan, 1379, Bhavani Peth, Pune—411002.
১৭. সবধরনের ফলফুল তরকারি— ঐ	Mullick's Horticulture Nursery, Kanke Road, P.O. Ranchi, Bihar, Pin—83-4008
১৮. পাতাসার, হর্মোন, ঐ	Paushak Ltd. Allembic Road, Vadodara—390003.
১৯.গাছের স্বাভাবিক জীবাণু খাবার ঐ	Indian Organic Chemicals Ltd. Khopdi, Dt. Raigad, Maharashtra 410203
২০. গাছের সবরকম খবরাখবর, বাগান করা, ঘর দোকান কলকারখানায় গাছ সাজান ঐ প্রভৃতির পরামর্শদাতা	Fredi Surti Company, 2, SaklatPlace, Cal-700013
২১. ঐ ঐ	Sutton and Sons 13D, Russell street Calcutta-700071
২২. ঐ ঐ	Shanti Nursery, Hatikandi. P.O. Jirat, Dt. Hooghly. W.B.
২৩. ঐ বিশেষ করে ডালিয়া ঐ	A. K. Dewan, Kulinpara, Khardaha, 24-Parganas, W.B.
২৪. ঐ ঐ	Bangashree Nursery, Krishnadevpur, P.O. Amtala, Dt-24-Parganas, W.B.
২৫. গ্লাডিওলাস গোলাপ প্রভৃতি ঐ	Sri Hili Chakraborty, Holikandi P.O. Jirat, Dt. Hooghly.

২৬. রজনীগন্ধা, মালা, ঐ	Sri Motilal Halder, Krishipalli P.O. Fulia
তোড়া, ফুলের গয়না, গাড়ি-খাট-	Dt. Nadia, W.B.
চেয়ার সাজান প্রভৃতি ঐ	
২৭. ফল-ফুল-বীজ ঐ	A. K. Dewan's Farm, Hazaribag, P.O. Hagaribag, Dt. Hazaribag, Bihar.
২৮. হর্মোন-চারাগাছ-বীজ পরামর্শ ঐ	Herbinger Phyto Chemicals Shyamnagore Station, P.O. Shyamnagore, 24-Parganas. (N) W.B.

॥ গাছের রোগ নিবারণে ঔষধ ॥

(১) Bavistin+Calixin (Systemic Fungicide) : গাছের ছত্রাক রোগ নিবারণের জন্য :

BASF India Ltd,

P. O. Box 1908, Bombay 400025.

গোলাপ—বগোনভেলিয়া—ডালিয়া—উন্নত জাতের Carnation (কারনেশন ফুল)—গাঁদা—পিটুনিয়া—আমেরিল্লাস্—গ্লাডিওলাস্—পাতা-বাহার গাছ প্রভৃতির জন্য—Itmadpur Nursery.

P.O. Amarnagore, Fadidabad—121003.

উন্নতজাতের বাগানের যন্ত্রপাতির জন্য :

American Spring Pressing Works Pvt, Ltd,

P, O, Box No 7602, Malad, Bombay-400064

॥ বইপত্রের জন্য ॥

Oxford Book and Stationery Co,

17, Park Stret, Cal-700016,

॥ গ্লাডিওলাস ফুলের গেঁড় বা Corm-এর জন্য ॥

A. P. Products & Co.

519, Bombay Market, Bombay-400038

॥ নিয়ন্ত্রিত সেচের জন্য ॥

Wavin India Ltd. (Irrigation System Div,)
706, Rohit House,
3, Tolstoy Marg, New Delhi-11001
Fedi Surti Co,
(Horticulturist, Garden Consultants, Landscape Architect, Seeds Merchants) 2, Saklat Place, Cal-700072.

বিদেশী গেলাপফুলের জন্য—Pratap Nursery (Behind Gandhinagar) P,O, Jaipur 4, Rajasthan, India,

উদ্যান বা বাগান সংক্রান্ত সব জিনিসের জন্য—Mullick's Horticultural Nursery Kanke Road, P.O. Ranchi, Bihar, Pocha Seeds Pvt, Ltd, (Near Solapur Bazar) pune, 411001

॥ ব্যবসায়ের উপযোগী কয়েকটি ফল ॥

॥ আম (ম্যাংগিফেরা ইণ্ডিকা)

পশ্চিমবাংলায় আমের বেশ ব্যাপক চাষ হয়, বিশেষ করে মালদা-মুর্শিদাবাদ হুগলি-নদীয়ায়। বেশ কয়েকটি উন্নত জাতের আম আছে,—যা দেশ-বিদেশে প্রচুর সুনাম পেয়েছে। গরমকালে বিদেশী রাজপুরুষ এসেছেন অথচ আম খাননি, এ বড় বিরল ঘটনা। আম বাইরে প্রচুর রপ্তানি হচ্ছে এবং আরও হবে, যদি বিদেশে আম পাঠাবার সুযোগগুলি আমরা ঠিকমতো নিতে পারি।

সমুদ্র সমতল থেকে ১৫০০ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত আম খুব ভাল জন্মায়। খুব শুকনো আবহাওয়া এবং অতিবৃষ্টি সহ্য করতে পারে।

প্রকার ॥ আমের প্রকার বা প্রজাতি খুব বেশি। বিশাল দেশ ভারতে একই প্রজাতির আম বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন নামে চলে। তবু সচরাচর যেগুলি চাষ হয় ব্যবসার ভিত্তিতে—ল্যাংড়া, বোম্বাই, হিমসাগর, কৃষ্ণভোগ, গোলাপখাস, জর্দালু, আলফানসো, মল্লিকা, চ্যাটার্জি, নীলম, রত্না, বিবিপসন্দ প্রভৃতি।

জাহাঙ্গীর-হিমাউদ্দিন খুব ভাল জাতের ফল দেয় কিন্তু ফলন কম বলে ব্যবসায়ের সম্ভবনা কম।

চাষ ॥ চোক-কলম অথবা আসন্ন কলমের দ্বারা অঙ্গজ বিস্তার করা হয়ে থাকে। কলম বা কলি বসানোর সবচেয়ে ভাল সময় অল্প বৃষ্টিপাত অঞ্চলে বর্ষার

শুরুতে এবং অধিক বৃষ্টিপাতের অঞ্চলে বর্ষার শেষে। কলমের গাছগুলি ৬-১২ মাসের মধ্যে মাঠে বসানোর উপযোগী হয়। যে সব কলম খাড়া হয়ে জন্মায় তাদের বেছে নিয়ে খামারের আবর্জনা সার (৪৫ কিলো) এবং মিশ্রসারে যাতে ০·২২৫ কিলো নাইট্রোজেন, ০·৪৫ কিলো ফসফোরিক অ্যাসিড, এবং ০·২২৫ কিলো পটাশ আছে—চারার গর্তে ফেলে দিয়ে চারা বসাতে হবে। অনুর্বর বা বাঁজা মাটিতে ৮-৯ মিটার দূরে দূরে আর গভীর উর্বরা মাটি হলে ১৫-১৭ মিটার দূরে বসাতে হবে। অল্প বৃষ্টি অঞ্চলে বর্ষার শুরুতে এবং অধিক বৃষ্টিপাতের জায়গায় বর্ষার শেষে চারা বসাবার সময়। কলমের জোড় মাটির অন্ততঃপক্ষে ১০ সেমিঃ ওপরে রাখতে হবে।

ছাঁটাই ॥ রুটিনমাফিক ছাটাইয়ের দরকার হয় না। ৪ বছর পরে মরা ডাল, ঘনভাবে ডাল থাকলে বা অপুষ্ট বা বিকলাঙ্গ ডালপালা ছেঁটে ফেলা উচিত।

সাথী চাষ, যত্ন ॥ চারা বসানোর আগে ভালভাবে চাষ দিয়ে বিদে লাগিয়ে জমি সমান করা উচিৎ। তারপর দুবার করে,—বর্ষার শুরুতে এবং বর্ষার শেষে অথবা শীতকালে লাঙল দিয়ে বিদে দিতে হবে। প্রতি ২ বা ৩ বছর অন্তর সবুজ সার দেওয়া ভালো। অল্প সময়ের বাড়তি ফসল, যেমন সবজি প্রথম ৪-৫ বছর লাগানো যেতে পারে। ছোট চারার ধারাবাহিক সেচের প্রয়োজন। ৪-৫ বছর পরে চারা ভালভাবে লেগে গেলে অনেকে আর সেচের কথা চিন্তা করেন না। শীতকালে ফুল ফোটার আগে যেখানে মাটির জল ধরে রাখার ক্ষমতা বেশি, সেখানে সেচের দরকার পড়ে না। ধারাবাহিকভাবে সার দিলে ভালো ফলন পাওয়া যায়। সার দেবেন ভালো ফলনশীল গাছ হলে,—খামারের সার (৪৫-৭০ কিলো), নাইট্রোজেন (০·৫-০·৭ কিলো), ফসফোরিক অ্যাসিড (০·৭-১·০ কিলো), পটাশিয়াম বা পটাশ (১·২-১·৫ কিলো)। নাইট্রোজেন এবং পটাশের অর্ধেক বর্ষার আগে, এবং খামারের সার এবং অর্ধেক নাইট্রোজেন পটাশ আশ্বিন-কার্তিক বা ফুল ফোটার আগে।

ফলনের অনিয়মতা ॥ কলমের আম গাছ ৪-৫ বছর বয়স থেকে ফল দিতে আরম্ভ করে আর পরিপূর্ণ ফলন পাওয়া যায় ১০-১৫ বছরে। আমের অনিয়ম ফলন ফল চাষের এক ঝামেলা। অনিয়ম ফলনের ঘটনা যদিও যথেষ্ট কমিয়ে আনা যায়,—প্রজাতি বুঝে চাষ করে, আবহাওয়া তথা জলবায়ুর অবস্থা, এবং চাষবাসের ধরন ধারণের ওপর। ধারাবাহিক ফলন পাবেন—ঠিক প্রজাতির

আম চাষ করে, নিয়মমাফিক পরিচর্যা, এবং গাছে যথাযথ সার এবং কীটনাশক ওষুধ প্রয়োগ করে। বসন্তকালের বাড় যাতে পরের শীতকালে ফুল-মুকুল গড়ে ওঠে তার জন্য ০·৪৫-০·৯০ কিলো নাইট্রোজেন জমিতে দিতে হবে। ভারি নাবি বৃষ্টি হলে শীতকালে অতিরিক্ত একটি চাষ মাঘমাসে ফুল ফোটাতে সাহায্য করে। নির্দিষ্ট গাছকে গোল করে কেটে অথবা বেড় লাগানোর কাজ ভাদ্রমাসে করলে পরবর্তী শীতকালে অবশ্যই পুষ্পমুকুল বের হবে।

পুরাণো এবং চারা গাছের উন্নতি করা॥ খুব নিচু ধরনের আমগাছ এবং চারাকে উৎকৃষ্ট করা যায় কলম করে, মুকুট কলমের বেলায় গাছের কাণ্ড মাটি থেকে প্রায় ½ মিটার পর্যন্ত রেখে বাকি গাছ কেটে ফেলতে হবে। এরপরই ভাল গাছটার এক বা একের বেশি ডাল গাছটার বাকল এবং কাঠ চেঁচে ঢুকিয়ে দিতে হবে। ভাল হবে এবং মুকুল থাকবে তবেই নিকৃষ্ট গাছের মধ্যে এ ডাল ঢোকান যাবে। এইভাবে নিকৃষ্ট গাছটায় অনেক কলম করা সম্ভব।

পশ্চিমবঙ্গ গরমের দেশ। গাছ থেকে আম তোলার পর আম পাকতে সময় লাগে প্রায় পাঁচ দিন। কিন্তু অনেক সময় এই পাঁচ দিনের মধ্যেই আমে ছাতা পড়ে যায়। ছাতা পড়া বন্ধ করা যায় যদি এক লিটার জলে ১·৫ গ্রাম ম্যাংগিফেরিন দিয়ে চুবিয়ে রাখা যায়। ম্যাংগিফেরিন তৈরি হচ্ছে (Mangi- =1 ,3, 6, 7—Tetrahydroxyranthone—C_2B-D Glucoside).

ফল তোলা এবং বিপণন॥ আম পাকতে ৫-৬ মাস সময় লাগে। পশ্চিমবাংলায় বৈশাখ থেকে আষাঢ় পর্যন্ত। পাকা ফল সবুজ এবং শক্ত অবস্থায় বোঁটা থেকে পাড়তে হবে। আম গাছে ৩ থেকে ৫ খেপে প্রায় ১ মাস ধরে ফুল ফোটে, তার জন্যে ঐ নিয়মে ফল তুলতে হবে পাকার তালে তাল মিলিয়ে। এইভাবে যত্ন করে তোলা ফল ঝুড়ি অথবা কাঠের পেটিতে খড়-কাঠের গুঁড়ো, শুকনো পাতা বা পশমের আস্তরণ বিছিয়ে ভালো ভাবে বন্ধ করে দূরদেশে পাঠান উচিৎ। বিদেশে পাঠাতে হলে ফায়ারব্রাণ্ড বাক্সে মাত্র একটি স্তর করে আম পাঠাতে হয়।

কিভাবে আম পাকাতে হবে॥ আম পাকানোর জন্য ধানের খড়ের একটি স্তরের ওপর আম বিছিয়ে দিতে হয়। আবার খড় দিয়ে আরেকটি স্তর আম বিছান—এভাবে তিনটি স্তর পর্যন্ত আম দেওয়া যেতে পারে। রং ধরলেই বোঝা যায় পেকেছে। বন্ধ ঘরে কারবাইড গ্যাস দিয়েও অনেকে খুব তাড়াতাড়ি আম পাকিয়ে থাকেন।

ফলন ॥ আমের ফলন,—আমের প্রজাতি বা প্রকার, বাড়ের হার, ফুল ফোটা প্রভৃতির ওপর নির্ভর করে। ১০ বছর বয়সের একটি আমগাছ বছর পিছু ৩০০-৫০০ আম দেয়। ১৫ বছরে দেয় বছর পিছু ১০০০, ২০ বছরে ২,০০০-৫,০০০।

॥ ব্যবসায়ের জন্য কয়েকটি আম ॥

রত্না ॥ মহারাষ্ট্রের কোংকণ অঞ্চলে আলফান্‌সো খুব নাম করা আম। ব্যবসায়ের জন্য আমটি বিখ্যাত। আলফান্‌সোর কতগুলি দোষও আছে। পেকে গেলে খেতে স্পঞ্জের মতো মনে হয়। একবছর আম হলো তো পরের বছর নিষ্ফলা। তাই আলফান্‌সোর আর একটি বিখ্যাত আম নীলমের সঙ্গে মিলন ঘটিয়ে নতুন একটি আম—অবশ্যই সংকর,—রত্না তৈরি করা হয়েছে। এই সংকর আমগাছে রত্না খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে। দশ বছরে ৫·৭০ মিটার বিস্তার ঘটে, ৬·৭০ মিটার উঁচু। ডিসেম্বর—ফেব্রুয়ারি মাসেই ২৭% ভাগ ফুল ধরে যায়। ৪ বছরে আম দিতে আরম্ভ করে। মে মাস থেকে আম পাকতে আরম্ভ করে জুনের প্রথম সপ্তাহেই ফলন শেষ।

ফল আকারে বেশ বড়, লম্বায়—১০·৬৯ সেমিঃ, চওড়া-৮·৩৬ সেমিঃ, ঘন—৬·৯৮ সেমিঃ। পাকা আম সপ্তাহ খানেক ঠিক থাকে। শাঁসে মিষ্টি আর টকে মাখামাখি। গন্ধটাও মনমাতান। রত্না-আলফান্‌সো—নীলমের ভৌত-রাসায়নিক গুণাগুণ নিচে বলা হল ঃ

লক্ষণ	নীলম	আলফান্‌সো	রত্না
আমের গড় ওজন (গ্রামে)	২২৫	২৫০	৩১৫
শাঁস গড়ে (শতকরা)	৭৩·৯	৭৪·৬০	৭৮·৬২
দ্রবণীয় কঠিন পদার্থ (ঐ)	১৭·৫০	১৯·০০	২৩·০০
মোট চিনি (ঐ)	১২·০৭	১৫·৮৬	১৬·৮১
অম্লতা (শতকরা)	০·২৭	০·৩৪	০·২৬
ভিটামিন 'সি' (মিলিগ্রাম।১০০ গ্রাম)	২২·৫	৩৩·৫	২৫·০

॥ পীচ্‌ফল (এলবারটা) ॥

কলকাতার একটি প্রথম শ্রেণীর সংবাদপত্রের কৃষি-সাংবাদিককে প্রশ্ন করেছিলাম,—পশ্চিমবাংলায় পীচ্‌ফল চাষ কি সম্ভব ? আর ব্যবসায়ের ভিত্তিতে এর ভবিষ্যৎ কি ? হেসে বলেছিলেন ভদ্রলোক,—পশ্চিমবাংলা এমন একটা

বাঁধাকপি

টম্যাটো

পাতিলেবু

ওলকপি

গাজর

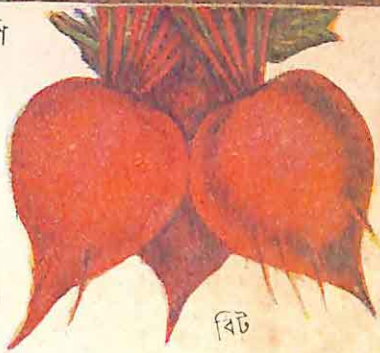

বিট

ফলকপি

শালগম

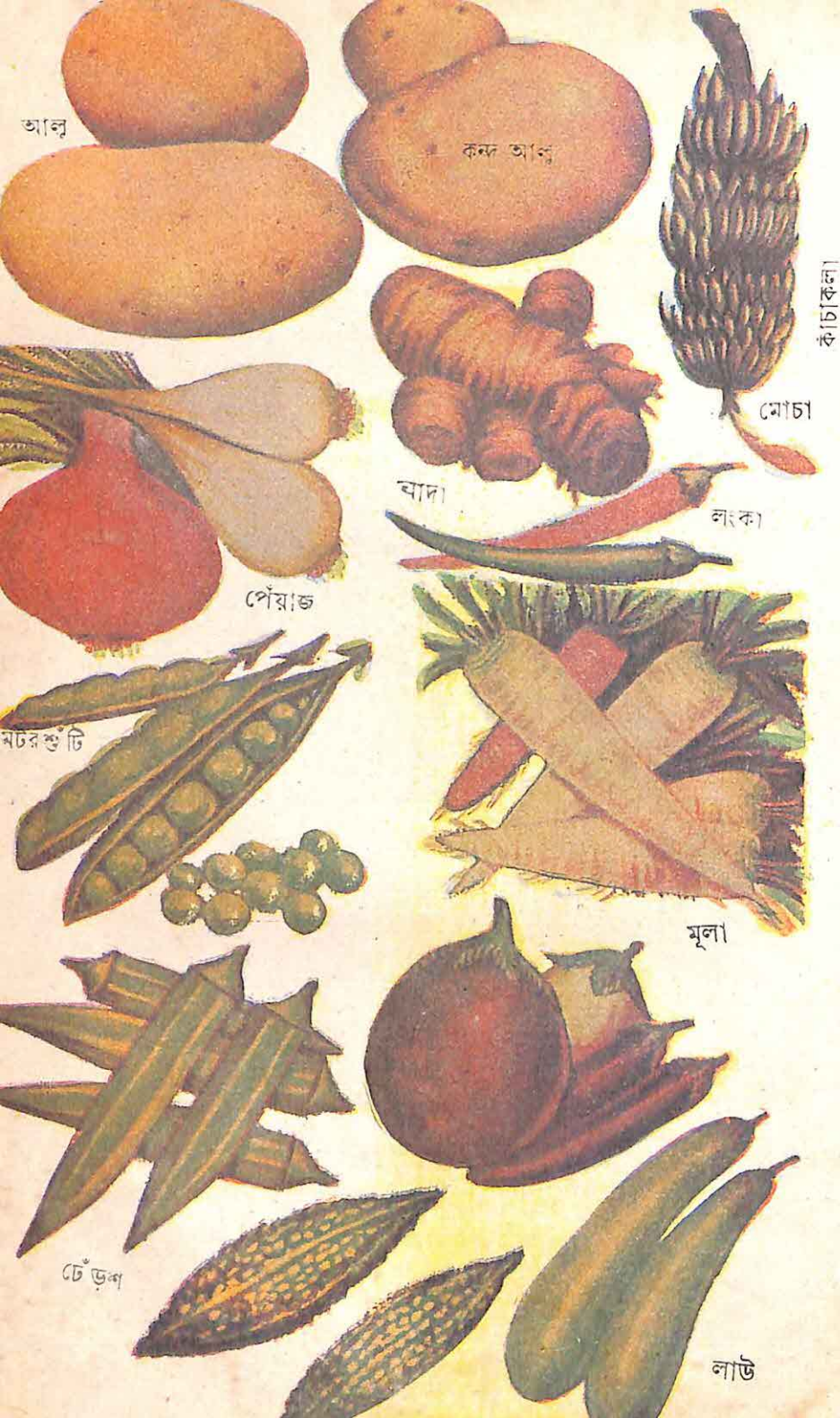
আলু
কন্দ আলু
কাঁচাকলা
মোচা
আদা
লংকা
পেঁয়াজ
মটরশুঁটি
মূলা
ঢেঁড়শ
লাউ

প্রদেশ যেখানে সবরকমের জলবায়ু আর মাটি পাওয়া যায়। হ্যাঁ, ব্যবসায়ে প্রচুর সম্ভবনা রয়েছে পীচ্ ফলের। কালিম্পঙে প্রচুর পীচ ফল হয়। স্থানীয় নাম আড়। পীচফলের উন্নত চারা প্রভৃতির জন্য লিখতে পারেন (১) গড ভ্যালি, ফ্রুট্ রিসার্চ ষ্টেশন, গাড়ওয়াল, হিমাচল প্রদেশ।

হ্যাঁ, বিদেশে ব্যবসায়ে প্রচুর সম্ভাবনা য়য়েছে ফলটার। পীচের মত সাহেবদের কাছে প্রিয় ষ্ট্রবেরি প্রচুর বিদেশে চালান যায়। এলবারটা উত্তর প্রদেশ এবং হিমাচল প্রদেশের ঠাণ্ডা জলবায়ুতে খাপ খায়নি। স্পষ্ট করে বলা যায়, পশ্চিমবঙ্গেও খাবে না।

কিন্তু কিছু উন্নত ধরনের খুব বেশি ফল দেয় এমন কতগুলি প্রজাতি আমেরিকার ফ্লোরিডা থেকে এনে পাঞ্জাব অঞ্চলে চাষ করে বেশ সুফল পাওয়া গেছে। ব্যাপারটা আরম্ভ হয়েছিল ১৯৬৮ সালে। অনেকগুলি প্রকার নিয়ে কাজ করা হয়েছিল, যেমন,—ফ্লোরডাসাম্, সান্-ই-পাঞ্জাব, ফ্লোডারড্, এবং সান্ রেড্। এরপরেই চাষটা সাধারণ চাষিভাইয়েদের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হয। ব্যবসায়ে প্রচুর লাভ করে তারা, যেহেতু ফলগুলি তাড়াতাড়ি পাকে, প্রচুর ফলন, চারা দ্রুত ফলনশীল হয়।

॥ পীচফলের প্রজাতি বা প্রকারের পরিচয় ॥

ক. **ফ্লোরডাসাম্** ॥ সমস্ত প্রকারগুলির মধ্যে এইটিই তাড়াতাড়ি বাড়ে। এপ্রিল মাসের শেষ দিকে বাজারে বেচা যায়। কাজেই চাষিভাই প্রথম মওকায় পয়সাও পায় প্রচুর। আকারে মাঝারি থেকে বড়, গোলাকার, শাস হলদেটে ওপর নীলচে-লাল। স্বাদ মিষ্টি থেকে রসাল। ফল পাকলে আঁটি আলগা হয়ে যায়। পূর্ণবয়স্ক গাছ বছরে ১০০ কেজি পর্যন্ত ফল দেয়।

খ. **সান্-ই-পাঞ্জাব** ॥ মে মাসের ছয় সপ্তাহে ফল পাকে। বড় ধরনের ফল, ব্যাস ৫·৫ সেমিঃ। প্রতিটির ওজন ১০০ গ্রাম। গড়নে বেশ শক্ত, হলদেটে শাস আঁটি শূন্য। স্বাদে-গন্ধে অপূর্ব। ফল হিসেবে খেয়ে অতিরিক্ত ফল টিনজাত করে বিদেশে রপ্তানি সম্ভব।

গ. **ফ্লোভারড্** ॥ মে মাসের শেষে পাকে। বড় ধরনের ফল, গড়ে প্রতিটির ওজন ১০০ গ্রাম। নরম শাঁস, রসাল এবং আঁটি শূণ্য। খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে। বছরে ফলন দেয় গড়ে ১২৫ কেজি গাছ প্রতি।

ঘ. **সান্ রেড্** ॥ মধুর মত মিষ্টি এবং গন্ধ যুক্ত এই প্রকার ফলের খোসা মসৃণ। মে মাসের মাঝামাঝি পাকে। শক্ত শাঁস, রং হলদে, আঁটি শূন্য।

সান্-ইপাঞ্জাবের পীচ্ গাছের মত এই প্রকারের পীচ গাছ ব্যবসায়ের খাতিরে স্থানান্তর করা যায়। শুধু ফল বেচেই নয় গাছ বিক্রি করেও এই প্রকারের ব্যবসায় সম্ভব।

॥ জায়গা নির্বাচন ॥

নতুন করে পীচ বাগান করতে হলে,—জমি পাকা রাস্তার ধারে হবে যাতে সহজে ফসল রেল মারফৎ স্থানান্তর সম্ভব হয়। ভিজে ভারি মাটি পীচ গাছের পচ্ছন্দ নয়। জল-নিকাশি ব্যবস্থা আছে এমন দো-আঁশ মাটি পীচ ফলের জন্য বাছতে হবে। জমির তিন মিটার গভীরতা পর্যন্ত কোন শক্ত পাথর অথবা চূণ থাকবে না।

॥ পীচ গাছকে রক্ষাকরণ ॥

মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত কীটপতঙ্গ এ্যাফিড্ পীচ গাছের পাতা মোড়া রোগ সৃষ্টি করে। এই রোগ তথা ফসলের সর্বনাশ আটকাতে দুবার ওষুধ ছিটিয়ে দিতে হবে। ওষুধটা তৈরি করবেন—৬০০ গ্রাম সেওফস্ ৭০ ডি পি (মেনাজন) অথবা ৫০০ মিলি. রোজার ৩০ ইসি (ডাইমেথোস্টেট) ৫০০ লিটার জলে গুলে। এই ওষুধটা লাগাবেন দুবার। প্রথম বার দেবেন যখন গাছ অফলা থাকবে। দ্বিতীয় বার দেবেন যখন গাছে ফল এসেছে।

কোনো কোনো জায়গায় কালো এফিড্ও গাছকে আক্রমণ করে। পাশের বাগান বা মাঠে পতঙ্গগুলি উড়ে এসে গাছের মূলকাণ্ড আর তার শাখা-প্রশাখা আক্রমণ করে। ৫০০ মিলি মেলথিওন্ বা রোজার ৫০০ লিটার জলে মিশিয়ে ছিটিয়ে দিতে হয়।

বিস্তার-চাষ প্রভৃতি ॥ আড়ুর চারার ওপর কলি বসিয়ে পীচফলের বিস্তার করা যায়। বসন্তের গোড়ায় এক বছর বয়সের কলম, ৬-৭·৭৫ মিটার অন্তর বসানো হয়। গাছের ছালকে সূর্যের তাপ থেকে রক্ষা করতে গাছে চূণকাম করা দরকার।

ছাঁটাই-যত্ন ॥ চারা লাগাবার সময় মাটির ওপরে ০·৬ মিটার রেখে বাকি কাণ্ড কেটে ফেলতে হবে এবং মূল কাণ্ডের চারপাশ ঘিরে ৩-৪টি মাত্র শাখা বাড়তে দেওয়া হবে। প্রথম গ্রীষ্মে অন্য যে শাখাগুলি গজায় সেগুলি ছেঁটে ফেলতে হবে। প্রথম অব্যক্ত মৌসুমে দুটি ভাল দূরত্বের দ্বিতীয় স্তরের শাখা, প্রত্যেকটি প্রধান শাখায় রেখে দ্বিতীয় স্তরের শাখার ঘা ঘেঁষে প্রধান শাখাগুলি

ছেঁটে ফেলতে হবে। দ্বিতীয় বা পরের গ্রীষ্মকালে যদি কোনো জল শাখা বের হয় তবে সেটাও ছেঁটে ফেলতে হবে। শীতকালে দ্বিতীয় ছাঁটাইয়ের সময় দ্বিতীয় স্তরের শাখাগুলি গাছের সৌষ্ঠব বজায় রাখা ছাড়া ছাঁটা হয় না। ছাঁটাইয়ের সময় বাইরের মুকুল পর্যন্ত ছাঁটা উচিৎ যাতে গাছ বেশ ছড়িয়ে পড়তে পারে।

ফলন্ত গাছের বেলা গাছের মাঝখানটা খোলা রাখার জন্য বার্ষিক ছাঁটাই প্রয়োজন। ২-৩ বছরের পুরান শাখাগুলি বাইরের দিকে নিশানা করা শাখাগুলি পর্যন্ত কেটে ফেলা যেতে পারে, যাতে শাখা বেড়ে উঠতে পারে। বাইরের শাখাগুলি ছাঁটতে এবং পাতলা করতে হবে যাতে প্রতি বছন নতুন ডালের বাড় উৎসাহিত হয়। সন্তোষজনক বাড় তখনই হবে যখন গাছ বছরে ৪৫-৫০ সেমি. বাড়বে।

ফলের কলি ১ বছরের পুরানো ডালের পাশ ঘেঁষে এবং ছোট ছোট নতুন ডালে জন্মায়। সাধারণত প্রতিটি পর্বে দুটি ফলের কলি এবং একটি পাতার কলি গজায়। ফলের কলিগুলি সাধারণত ডালের মাঝ থেকে ওপরে গজায়। শাখা কাটবার সময় ফলের কলির অবস্থান বিবেচনা করা উচিৎ।

পীচফলের বাগান ধারাবাহিকভাবে চাষ করা উচিৎ। জমি সাধারণত শীতের সময় চাষ দেওয়া হয় এবং ১০ সেমিঃ বেশি গভীর হওয়া উচিৎ নয়। ফল তোলার পর বর্ষাকালে একটি আচ্ছাদনী বা সবুজ সারের ফসল তোলা যেতে পারে। এই ফসলটি আবার শীতকালে চাষ দিয়ে জমিতে মিশিয়ে দিতে হবে। বসন্তকালে ফলন্ত গাছে হেক্টর প্রতি ৫৫-৬৪ কিলো নাইট্রোজেন, ৫৫-৬৫ কিলো ফস্‌ফেট এবং ১২০-১৩৫ কিলো পটাস সার প্রয়োগ করা যেতে পারে। মে থেকে জুন মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত স্বাভাবিক ফল ধরার পর ফল পাতলা করতে হবে যাতে ১০-১৫ সেমিঃ অন্তর ফল থাকে।

ফল তোলা এবং বিপণন॥ আমের মতই পীচফল শক্ত থাকতে গাছ থেকে তোলা উচিৎ যাতে পরিবহন করার সময় ফল নিজেই পেকে যায়। পরিবহন করবেন আমের মত।

॥ কাজু বাদাম (এনাকার্ডিয়াম্ অক্সিডেন্টেল)॥

১৪ বছর আগে আমরা সকালে চায়ের সঙ্গে কাজু বাদাম খেতাম। আজ সেটা স্বপ্ন, কলকাতার বিরাট বড়লোক প্রকাশককে বলেছিলাম,—আপনি নিশ্চয়ই কাজু বাদাম খান? হেসে বলেছিলেন ভদ্রলোক,—ও-সব বড়লোকের

জিনিস আমি খাব কি করে ? পরীক্ষা করবার জন্যে আরও কয়েকবার একই প্রশ্ন করেছিলাম। উত্তরটা ছিল একই।

সত্যি কাজুবাদাম কলকতার বড়লোকদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। যায় কোথায় কাজুবাদাম ? মেদিনীপুরে পশ্চিমবাংলার একমাত্র ব্যাপক কাজুবাদামের চাষ। মেদিনীপুর থেকে সরাসরি চলে যায় মাদ্রাজে। তারপরই সেখান থেকে প্যাকিং হয়ে আবু-দুবাই তথা পেট্রোলে ফুলে-ফেঁপে ওঠা দেশগুলোতে। দাম দেড়শো টাকার কাছাকাছি। পোস্তর দাম আজ ১০ টাকা থেকে ৩৫-৪০ টাকা। সেই পোস্তও তো আমরা খাচ্ছি। কাজুবাদামের চাষ খুব একটা কঠিন নয়। মেদিনীপুরে হেলাফেলায় কাজুবাদামের গাছ পড়ে থাকতে দেখেছি। বেকার ভাইয়েরা একটু উদ্যোগ নিয়ে যদি এর ব্যাপক চাষ করেন তবে আমাদের বড়লোকরাও কাজুবাদাম খেতে পারেন। হোক না সেটা দেড়শো টাকা !

কাজুবাদামকে অনেকে হিজলি বাদাম ও বলে। এই গাছের চাষ অনেক ফলের জন্যও করে থাকেন। মেদিনীপুর অঞ্চলে চাষ হয়, কিন্তু ধারাবাহিক বাগিচা করে চাষ খুব কমই হয়। উত্তর ভারতের প্রচণ্ড গরম অথবা শীত কাজুবাদাম সহ্য করতে পারে না। দক্ষিণ ভারতে ৩০০ মিটার চেয়ে বেশি উচ্চতায় কাজুবাদাম ভালো জন্মায় না। কাজু গাছের জন্য খুব একটা জমি বা মাটি লাগে না। পাথুরে মাটিতে বা বালিতেও গাছটা জন্মাতে পারে। ভালো জল নিকাশি ব্যবস্থা থাকা দরকার। যে-সব অঞ্চলের বৃষ্টিপাতের তারতম্য ৫০-৪০০ সিমিঃ সেখানে গাছটা ভালই জন্মায়। সার্থক কাজু বাগিচা তৈরিমে মাটির আর্দ্রতা দরকার।

কাজু গাছের প্রকার বা প্রজাতি ॥ খুব একটা প্রজাতি নেই। বীজ থেকে গাছ তৈরি করলে ফল আর বাদামের প্রকৃতিতে বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। উন্নত জাতের বংশবৃদ্ধি অঙ্গজ বিস্তারে ভাল হয়।

বিস্তার এবং বপন ॥ যথাস্থানে বীজ লাগান সাধারণ নিয়ম কিন্তু এক মাসের চারা প্রায় ⅔ অংশ কেটে ফেলে অন্য জায়গায় সারিয়ে বসালে ভাল ফলন পাওয়া যায়। মাটির ওপর গুটি, আসন্ন কলম, পাশে কলম, এভাবেও গাছের বিস্তার করা যেতে পারে। ল্যাটেরাইট এবং পাথুরে মাটিতে বপনের দূরত্ব বেশি। গভীর দো-আঁশ মাটিতে ১২ মিটার পর্যন্ত।

পরিচর্যা ॥ সত্যি কথা বলতে কি চাষ, সেচ অথবা সার প্রয়োগের জন্য কোন দৃষ্টি দেওয়া হয় না। মাঝে মাঝে নিচেকার জংগল পরিষ্কার

করে মরা এবং রোগগ্রস্ত ডালপালা ছেঁটে ফেলে দিলে গাছ সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাবে।

ফসল ॥ ফাল্গুন-চৈত্র থেকে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে পাকে। অগ্রহায়ণ মাসে প্রচুর বৃষ্টিপাত হলে ফল পাকতে বেশি সময় নেয়। প্রথম ফসল গাছ লাগাবার ৩ বছর পরে পাওয়া যায়। মনোমতো ফসল পাবেন ৮ বছর পরে। হেক্টর প্রতি ফলন পাওয়া যায় ১১০-১২০ কিলো।

পরিচর্যা এবং প্রস্তুত করা ॥ ফল পাড়বার পরেই বাদাম ফল থেকে আলাদা করে নেওয়া হয়। ফলকে কাজু আপেলও বলা হয়। শুকনো খোলা লোহার কড়াই অথবা লোহার নলের মধ্যে শুধু গরমে ঝলসানো যায় অথবা তেল দিয়েও ঝলসান চলে। ঝলসাবার পরেই হাত দিয়ে খোসা ছাড়িয়ে ফেলা হয়। এরপরই খোসা-ছাড়ান বাদাম খোলা বাতাসে অথবা ছোট ছোট ঘরে গরম বাতাস দিয়ে শুকান হয়। এরপরই রাখা হয় ঘামাগ ঘরে। ঠিক এর-পরেই বাদামগুলি আকার অনুসারে বাছাই এবং বাছাইয়ের পর বাক্স বন্দী করা হয়। বিদেশে কাজু বাদাম সাধারণত পাঠনো হয় বায়ুশূন্য অথবা কার্বন-ডাই-অক্সাইড ভরা কৌটায়। দেশের জন্য টিনের কৌটায় বন্ধ করে চালান দেওয়া হয়।

॥ সফেদা (এ্যাক্রাম্ স্যাপোটা) ॥

বর্তমান যুগটা হচ্ছে দেখানোর যুগ, অর্থাৎ আগে দর্শনধারী পরে গুণ-বিচারি। আগে এক সের পালং শাকের গাছ উঠতো পাল্লায় দশ-বারোটা আজ একটা পালং গাছের ওজন পাঁচ কিলো। কিছুদিন আগেও দেখেছি সফেদা হতো বাচ্চাদের খেলবার মারবেল পাথরের মত,—আজ ক্রিকেটের বলের কাছাকাছি। লক্ষণটা ভালো। নতুন প্রকার বা প্রজাতি বার করে খোসাটা যদি আরও শক্ত করা যেত তবে অনায়াসে বিদেশের বাজারে বিকোতো ভালো। খোসা শক্ত না হওয়ার জন্য তাড়াতাড়ি ফলটা পচে যেতে পারে। বিদেশের বাজারে না গেলেও স্বদেশের বাজারে ফলটা দশগুণ বেশি বিক্রি হতে পারে। চাহিদা প্রচুর। বারুইপুর সফেদা চাষের জন্য বিখ্যাত।

যে-সব ফল সবরকম আবহাওয়ায় জন্মাতে পারে,—সফেদা তাদের মধ্যে অন্যতম। পাঞ্জাব হিমাচল প্রদেশের শুকনো শীত থেকে পশ্চিমবাংলায় প্যাচ্‌পেচে গরমে পর্যন্ত ফলটা জন্মায়। চিরহরিৎ গাছ সফেদা। সারা বছরই

বাড়ে আর ফুল ধরে। বৃষ্টি অথবা মেঘলা আবহাওয়ায় ফল ধরার কোনো ব্যতিক্রম নেই। ছোট চারা গাছ অল্প তুহিনে নষ্ট হয় কিন্তু বড় গাছ সেই তুহিন সহ্য করতে পারে। নির্দিষ্ট কোনো মাটির প্রয়োজন নেই, তবে জল নিকাশি পলিজ অথবা পলি দো-আঁশ মাটিতে ভাল জন্মায়।

প্রকার ॥ মাদ্রাজে ক্রিকেট বল এবং দ্বারোপুদি। দেখতে এরা গোল। অন্ধ্রপ্রদেশে ব্যাংগোলোরা, ভ্যাভিলা ভ্যালোসা (দেখতে ডিমের মত), জোম্না-ভ্যালোসা (গোল) কৃতবারতি এবং পোট বেঁটে গাছ। পশ্চিম ভারতে প্রচলিত প্রকার হলো কালিপট্টি, এবং ছত্রী (ডিমের মত), সবগুলিই পশ্চিমবাংলায় চাষ সম্ভব।

বিস্তার এবং বপন ॥ বিস্তারে মাটির ওপরে অথবা নিচেকার গুটি অথবা আসন্ন কলমের দ্বারা। পার্শ্বীয় জোড় কলম এবং কলি বাসানোও সম্ভব। গোড়ার গাছ (Stock) রায়ান, মানিকারা অথবা মহুয়া গাছ ব্যবহার সম্ভব। মহুয়াকে অনেকে অনুমোদন করেন না,—যেহেতু কাজ ভাল দেয় না। ৪.৫ থেকে ৬ মিটার দূরে দূরে চারা বসনো চলে।

কৃষ্টি-পরিচর্যা ॥ বপনের পূর্বে জমি লাঙ্গল দিয়ে এবং বিদা দিয়ে জমি সমান করা উচিৎ বর্ষাকালে ছাড়া প্রতি ৬-১২ দিন অন্তর সেচ দেওয়া হয়। প্রতি ৩-২ বছর অন্তর লাঙ্গল অথবা বিদা দিয়ে আগাছা সংস্কার ও মাটি আলগা করলে ভালো কাজ হয়। আমের মতই জৈব এবং রাসায়নিক সার অনুমোদন করা যায়। ফলন্ত গাছের বেলায় অর্ধেক পরিমাণ সার কার্তিকে বাকি অর্ধেক ফাল্গুনে অথবা বর্ষার আগে দেওয়া দরকার।

প্রথম ৬-১০ বছর বাড়তি ফসল হিসেবে সবজি চাষ সম্ভব। এই গাছে কোন ছাঁটাইয়ের প্রয়োজন নেই।

ফল তোলা এবং ব্যবসায় ॥ চার-পাঁচ বছর থেকে ভালভাবে ফল ধরতে শুরু করে। ফল পাকতে সময় নেয় ৪ মাস। ফুল সারাবছরই ধরে দেখা দেয় ফল তোলার উপযুক্ত সময় দুই-তিনটি মরসুম। পশ্চিবাংলায় জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় এবং আশ্বিনে ফলনের তারতম্য ৪র্থ বছরে ২০০-৩০০, ৭ম বছর বয়সে ৭০০-৮০০, দশম বছরে ১৫০০-২০০০। ২০-৩০ বছরে ২৫০০-৩০০০। পাকা ফল চেনা যায়—নখের আঁচড়ে যদি হলুদ রং বের হয় ফলে। কিন্তু কাঁচা ফলে দেখা যাবে সবুজ রং।

দূরের বাজারের জন্য তোলার পর ফলগুলি বাঁশের ঝুড়িতে খড় বা বিচুলির

আবরণে ঢেকে পাঠানো যাবে। ডিম আর গোলকার ফল আলাদা আলাদা ভাবে ভরতে হবে।

॥ পেঁপে (ক্যারিকা প্যাপাইয়া) ॥

কলকাতার কাছেই একটা স্টেশনে দেখলাম একজন ফড়ে প্লাটফর্মে বসে পেঁপের পাহাড়ের মধ্যে সামনে ব্লেড চালিয়ে পেঁপের সাদা কষ বা আঠা বের করে নিচ্ছে। ওটা ওষুধে যাবে। বাদ বাকি পেঁপেটা যাবে মানুষের পাতে তরকারি হয়ে। ফল হিসেবে পাকা পেঁপের ভীষণ কদর।

পেঁপের ব্যবহার ॥ পাকা পেঁপের ভিটামিন 'এ' প্রচুর রয়েছে (২০২০ আই. ইউ.) শ্বেতসার (১০%), খনিজ পদার্থ (০.৫%:), ভিটামিন 'সি'. থায়ামিন, রাইবোফ্লেবিন্ নিয়াসিন। কাঁচা পেঁপের রসে আছে পাপেন। ওষুধে এবং কলকারখানায় ব্যবহার করা হয়। পাপেন হজমির উৎসেচক, পুরানো রোগ এবং বাচ্চাদের পায়খানা বন্ধ করতে ব্যবহার করা হয়। এর আরও ব্যবহার চামড়ার দোষে, চুলকানি রোগ (রিংওয়ার্ম) এবং অনেকগুলি পেটের অসুখের বিরুদ্ধে প্রতিষেধক রূপে।

রিজওন্যাল রিসারচ স্টেশন, আই. এ. এ. আর. আই, পুসা, বিহার পেঁপের কতগুলি প্রকার বের করেছে। তারা হল,—পুসা ম্যাজেস্টি (২২-৩), পুসা ডিলিশিয়াস্ (পুসা ১-১৫), পুসা-জায়েণ্ট (পুসা ১-৪৫ভি), পুসা-ডোয়ারফ্ (পুসা—১-৪৫ডি)। সবগুলিই ব্যবসায়ে অনুমোদন যোগ্য।

১. **পুসা ডিলিসিয়াস্ (পুসা ১-১৫)** ॥ পুরুষ এবং স্ত্রীলিংগের গাছ। মাঝারি ধরনের গোল ফল, (১.৫ থেকে ২ ৫ কিলো) শাঁসের রং কমলালেবু।

২. **পুসা ম্যাজেস্টি** (পুসা ২২-৩) ॥ ঠিক পুসা ১-১৫র মত গোল, মাঝারি ধরনের ফল। অপূর্ব শাঁসের স্বাদ, রং হলদেটে। স্থানান্তরে পাঠাবার সময় অপচয় খুবই কম। জীবাণুকণা (ভাইরাস) রোগের বিরুদ্ধে লড়াকু।

৩. **পুসা-জিয়াণ্ট** (পুসা ১-৪৫ V) ॥ গাছ এক মিটার বড় হলেই ফল ধরে। খুব তাড়াতাড়ি গাছ বাড়ে, গুঁড়ি মোটা। ঝড়ের ধাক্কা সামলাতে শক্তও বটে। সবসময়ই যেখানে ঝড়-জল লেগে রয়েছে সেসব অঞ্চলের পক্ষে খুব ভালো গাছ। বড় মাপের ফল। ২.৫০ থেকে ৩.৫০ কিলো।

৪. **পুসা-ডোয়ারফ** (পুসা-৪৫ ডি) ॥ আগের তিন প্রকারের মত আলাদা-আলাদা স্ত্রী ও পুরুষ গাছ। তাড়াতাড়ি বংশ বিস্তারের পক্ষে খুব

ভালো গাছ। গাছের উচ্চতা ২৫ থেকে ৩০ সেমিঃ হলেই ফল ধরতে আরম্ভ করে। মাটির ঠিক ওপরেই ফল ধরে থাকে। লম্বাটে গোল ফল, মাঝারি মাপের (১ থেকে ২ কিলো)। ব্যবসায়ে এ-ফলের চাহিদা খুব বেশি।

আবহাওয়া এবং জলবায়ু॥ বেলে দো-আঁশ মাটি পেঁপে গাছের পক্ষে খুব ভাল। পশ্চিমবাংলার বেশ কয়টি জেলাতেও এ ধরনের মাটি পাওয়া যায়। তাই মোটামুটি সব জেলাগুলিতেই পেঁপের চাষ সম্ভব। মাটির প্রশম (PH) ৭-এর কাছাকাছি পেঁপের পক্ষে সবচেয়ে ভাল। বীজের মারফৎ পেঁপের চাষ হয়ে থাকে। এক হেক্টর চাষের জন্য প্রায় ২৫০ থেকে ৫০০ গ্রাম বীজের দরকার। ভাল পেঁপে পেতে হলে ভাল পেঁপের বীজের দরকার। প্রথমে বীজতলা করে নিয়ে পেঁপের চারা তৈরি করে নিতে হবে। বর্ষাকাল চারা তোলার সবচেয়ে ভালো সময়। চারাগুলি ২০-৩০ সেমিঃ বড় হলেই অন্য জায়গায় বসানো যায়। গোড়ার শিকড়ের চারধারে একদলা মাটি নিয়ে চারাগুলি তুলে বেশ কিছু চারার পাতা ছিড়ে ২.৫—৪ মিটার দূরে দূরে মাঠের মধ্যে ছোট গর্তে বসানো উচিৎ। প্রতিগর্তে ½ মিটার দূরে দূরে চারটি চারা বসানো যেতে পারে। গাছে ফুল আসার পর সামান্য কয়েকটি পুরুষগাছ পরাগ মিলনের জন্য রেখে বাকি সমস্ত পুরুষ গাছ তুলে ফেলে দিতে হবে। প্রতি ১০-২০টি স্ত্রীগাছের জন্য একটি পুরুষগাছ যথেষ্ট।

পরিচর্যা॥ শীতকালে প্রতি ১০-১২ দিনে একবার করে গাছে সেচ দেওয়া দরকার। গরমকালে ৬-৮ দিন অন্তর। ভালো জল নিকাশের ব্যবস্থা থাকা দরকার। চারা বসাবার সময় প্রতিগর্তে ৯ কিলো খামারের সার এবং প্রতি ১ মাস অন্তর বর্ষার শুরুতে এবং শীতকালে ৩৫-৪৫ কিলো ঐ খামার সার আবার দিতে হবে। মিশ্রসার যাতে আছে ২৫-৫০ কিলো নাইট্রোজেন, ৫০-১০০ কিলো ফসফেট, ৫০-১০০ কিলো পটাশ, প্রতি হেক্টরে দুভাগে ৬মাস অন্তর দেওয়া যেতে পারে। আগাছা নিয়ন্ত্রণ, হালকা চাষ, অথবা বিদা দেওয়া প্রয়োজন বছরে ১ বার কি দুবার। ছোট মাপের অল্পকালীন সব্‌জি বাড়তি ফসল হিসেবে চাষ করা যেতে পারে। গাদাগাদি বন্ধ করার জন্য মাঝে মাঝে চারা কমানো দরকার। যেসব ফসলের সারির দূরত্ব অনেক বেশি সেখানে পেঁপেকেই বাড়তি ফসল হিসেবে চাষ করা যেতে পারে।

পেঁপেগাছের রোগ এবং তার প্রতিকার॥ ক. 'ডাম্পি অফ' রোগ॥ বীজতলায় রোগটা দেখা যায়। রোগটা বন্ধ করতে বীজতলায়

ফরম্যাল ডিহাইড্ গ্যাস বা ফরম্যালিন্ দিতে পারেন। সবচেয়ে ভালো হয় যদি বীজগুলি ছিটোবার আগে ওদের এগ্রোসেন জি. এন. দেওয়া হয়।

খ. **কাণ্ড-পচা রোগ**॥ বর্ষাকালে রোগটা দেখা যায়। রোগাক্রান্ত গাছ সরিয়ে দিতে হবে। সুস্থ-সবল গাছগুলির গোড়ায় বোরদো পেস্ট (৫ : ৫ : ৫০) লাগিয়ে দিতে হবে।

গ. **পাতা কুঁচকান, মেজাইক প্রভৃতি**॥ সবগুলিই ভাইরাস্ রোগ। আদ্র বা স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় পাতা কুঁচকানো রোগ সবচেয়ে মারাত্মক। রোগাক্রান্ত গাছগুলি উঠিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। কীট-পতঙ্গের মারফৎ ভাইরাস রোগ যাতে না ছড়ায় তার জন্য কীটনাশক ওষুধ মাঝে মাঝেই ছিটিয়ে দিতে হবে।

ফল তোলা, ব্যবসা॥ ফল বুঝে বুঝে তুলতে হবে যাতে পরের ক্ষেপে যাদের তোলা হবে তারা যেন আলো-বাতাস পায়। পাকা বা পাকতে যাচ্ছে—এমন ফল গুলি খড় বা বস্তায় ঢেকে দেওয়া উচিৎ। পশু-পাখি টের পাবে না। একটা গাছ থেকে ৬০-কেজির মতো ফল পাওয়া যায় চারা লাগাবার ৬ মাসের মধ্যেই। একর প্রতি বছরে ১০,০০০ থেকে ১৫,০০০ টাকা হেসে খেলে পাওয়া যায়।

বীজ তৈরি করবেন কীভাবে॥ সুস্থ সবল স্ত্রী-আর পুরুষগাছ বেছে নিতে হবে পরাগ মিলনের জন্য। খুব যত্নের সঙ্গে বীজ পাকা ফল থেকে বেছে নিতে হবে। ছায়ায় বীজ শুকিয়ে পলিথিন ব্যাগে, জার-এ আর্দ্র আবহাওয়া থেকে দূরে বীজ রাখতে হবে।

॥ পেয়ারা (সিডিয়াম্ গুয়াভা) ॥

পশ্চিম বাংলায় পেয়ারার চাষ ঘরে ঘরে। ভুল বললাম, চাষ হয় না, আপনিই হয়। অনেকগুলিই খাওয়া যায় না, বিচিতে ভর্তি। উন্নত ধরনের পেয়ারার চাষ বাইরে হচ্ছে। আমাদের পশ্চিমবাংলার নদীয়া জেলায় কৃষ্ণনগরে ভালো পেয়ারার চারার খোঁজ নিতে পারেন। বীচিশূন্য বা সিড্লেশ পেয়ারা সবারই প্রিয়। ব্যবসায়ের ব্যাপারে পেয়ারার কি কোনো ভূমিকা আছে? অবশ্যই। অতিরিক্ত পেয়ারা হলে আমরা জ্যাম-জেলির দিকে ঝুঁকতে পারি। করাও খুব একটা কঠিন নয়। লাভও প্রায় মিষ্টি দোকানের মিষ্টির মত। আগে সে ম্যালমারড (অবশ্যই পেয়ারার) পাঁচ টাকায় শিশি পাওয়া যেত।—এখন সেটার দাম সাড়ে তের টাকা। জ্যাম-জেলি মালমারড্ প্রভৃতি তৈরি করতে

প্রথম প্রথম ভুল হবে, রং আসবে না, নানা ঝামেলা দেখা দেবে। পরে দেখবেন সব ঠিক হয়ে গেছে। স্টেশনারি দোকানে দিয়ে আসবেন, দোকানদার কমিশন কেটে আপনাকে আপনার দাম দিয়ে দেবে।

আমাদের দেশের মোট পেয়ারা চাষের জমির পরিমাণ প্রায় ৩০,০০০ হেক্টর যার মধ্যে উত্তরপ্রদেশে পড়ছে ৯,৮৪০ হেক্টর। বিহারের আওতায় আসছে ৪,৮০০ হেক্টর। গাছ খুব কষ্ট সহ্য করতে পারে—অনেকদিনের শুকনো আবহাওয়া গাছটির বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারে না, কিন্তু তুহিন একদম সহ্য করতে পারে না। সব ধরনের মাটিতে পেয়ারা চাষ সম্ভব। অবশ্য প্রশম (PH) হবে ৪.৫-৮.২। পেয়ারার ফলে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন 'সি' থাকে (প্রতি ১০০ গ্রামে ৩৫-১০০ মিলিগ্রাম)।

প্রকার ॥ লক্ষ্ণৌ ৪৯, এলাহাবাদ সফেদা এবং সিডলেশ হচ্ছে সাদা শাঁসের জাত। কিছু কিছু প্রকার বা প্রজাতি আছে যাদের শাঁসের রং গোলাপি এবং সাদা এবং খোসা উজ্জ্বল লাল।

বিস্তার এবং বপন ॥ বীজ এবং অঙ্গজ দুভাবেই বংশ বিস্তার সম্ভব। আসন্ন কলম, গুটি এবং মাটির ওপরের গুটি অনুসরণ করা হয়। শিকড়ের তেউড় শিকড়ের বীচন, এবং কলি বসান কোন কোন সময় সফল হয়ে থাকে। সাধারণতঃ বর্ষাকালে চারা তোলা হয় এবং ১বছর পরে তুলে বসানোর উপযোগী হয়। চারা বসানোর সাধারণ দূরত্ব হচ্ছে ৫.৫ থেকে ৬ মিটার।

পরিচর্যা ও কৃষ্টি ॥ বর্ষাকালে সবুজ সারের ফসল জন্মানো এবং বছরের বাকি সময় পরিষ্কার চাষ অনুমোদন করা যায়। বর্ষার শেষে এবং শীতকালে ফল তোলার সময়ের মধ্যে উত্তরভারতে ১ বা ২ বার সেচ দেওয়া। পশ্চিম-বাংলায় মাটির আর্দ্রতা থাকলে পশ্চিমবাংলায় সেচের কোন দরকারই হয় না। গোবর সার ছাড়া ৭৭.৫ থেকে ৯০ কিলো ফসফোরিক অ্যাসিড, ৪৫-৬০ কিলো নাইট্রোজেন, ১০০ থেকে ১১০ কিলো পটাশ সার দিতে হবে হেক্টর পিছু।

ছাঁটাই ॥ ছোট গাছে বছরে কয়েকবার ছাঁটাইয়ের দরকার যাতে সরু লম্বা ডাল বাড়তে না পারে। যেহেতু নতুন ডালে ফল ধরে সেজন্য ফল ধরতে সাহায্য করার জন্য ফল ধরা গাছের খুব বেশি ছাঁটাইয়ের প্রয়োজন। গাছ বেশ শক্ত না হলে ফুল তোলা উচিৎ এবং ফেলে দিতে হবে।

ফল তোলা ॥ যেমন পাকে তেমনি ফল তুলতে হবে। এ কাজ কয়েক

সপ্তাহ ধরে চলবে। দূরের বাজারে পাঠাতে ডাঁসা পেয়ারা তুলতে হবে। হেক্টর প্রতি ফলন পাওয়া যায় ২২,০০০ কিলো।

॥ আনারস (এ্যানানাস্ স্যাটাইভা ॥

কয়েক বছর হলো আনারসের ব্যবসা অসম্ভব বেড়ে গেছে। শিলিগুড়ি ত্রিপুরা প্রভৃতি জায়গা থেকে প্রচুর পরিমাণে আনারস কলকাতায় আসছে। শুধু কলকাতা শহরে নয় গণ্য-নগণ্য শহরে এমন কি অজ্ঞাত গ্রামে লরি থামিয়ে লুটপাটের মতো পাইকারি হারে আনারস বিক্রি হয়। মোটামোটি ২-৩ কেজি ওজনের সবুজ রঙের আনারস পাকায় বেশি মিষ্টি। ব্যবসায়ের চিন্তা করলে আনারস থেকে জেলি-জ্যাম-মারম্যালেড্-চাটনি অনায়াসে ঘরে তৈরি করে স্টেশোনারি দোকানে বিক্রির জন্য দেওয়া যেতে পারে। পশ্চিমবাংলার অনেক জায়গায় এখনও দেখা যায় আম-লিচু-কাঁঠাল বাগানের ছায়ায় ঢাকা বিরাট জমি শুধু পড়ে রয়েছে। অন্য কিছু সম্ভব না হলে ঐ সব অঞ্চলে অনায়াসে আনারসের চাষ করা যায়।

২১° সেলসিলাস থেকে ২৩°সেঃ তাপ মাত্রায় এবং সমুদ্র থেকে ১০০ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত আনারস ভাল জন্মায়। যেখানে তুহিনের অত্যাচার নেই, সমান বৃষ্টিপাত সেখানে অনায়াসে আনারসের চাষ হয়। নারকেল সুপারি বাগানেও আনারস চাষ চলে। সব রকমের মাটিতে আনারস হয়। তবে মাটিতে কাদার ভাগ বেশি থাকলে খুব একটা সুবিধা হয় না। সবচেয়ে ভালো মাটি হলো বেলে দোআঁশ, প্রশম (PH) ৫·৫-৬। গাছ প্রতি ১·৫ থেকে ২·৫ কেজি ওজনের ১টি করে আনারস হয়। মাটি যাই হোক, ভাল জল নিকাশি ব্যবস্থা থাকা চাই।

আনারসের চাষ প্রায় ৪,১০০ হেক্টর পরিমাণ জমিতে করা হয়।

প্রকার ॥ কিউ-কুইন এবং মারিশাস্ তিনটি জনপ্রিয় প্রকার। কিউ বেশ বড় আকারের ফল উৎপাদন করে এবং টিনে করে বিদেশে পাঠাবার পক্ষে চমৎকার। অন্য দুটির ফলের আকার ছোট কিন্তু উন্নত শ্রেণীর। কিউ-এর ফল দেরিতে আসে। কুইন জলদি এবং মরিশাস্ মাঝারি।

বিস্তার ও বপন ॥ আনারস সাধারতঃ তেউড় অথবা ফলের পাশ থেকে ওঠা চারার মাধ্যমে বংশ বিস্তার করে। তেউড় ওঠে মাটির নিচের কাণ্ডের যে কোনো জায়গা থেকে। ফলের বোঁটার পাশ থেকে তেউড় (স্লিপ) গড়ে এবং ফলের মাথায় দেখা দেয় মুকুট বা ক্রাউন। ফল তোলার পর বোঁটা চাকার

মত কেটে সেটাই বংশ বিস্তারের কাজে লাগানো চলে। তেউড় থেকে জন্মানো গাছে ১৮ মাসে ফল আসে কিন্তু স্লিপ্ এবং বোঁটার চাকতি থেকে গড়া তেউড়ের গাছে ফল ধরতে ২ বছরের বেশি সময় লাগে।

তেউড়ের নিচের পাতাগুলি ছাড়িয়ে নিয়ে তাদের বপনের আগে ৩-৪ দিন সূর্যের আলোতে তৈরি আলো-আঁধারির মধ্যে শুকিয়ে নিতে হবে। জল জমায় ভয় নেই এমন শুকনো নালিতে তেউড় বসাতে হবে। তেউড় বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাটি দিয়ে ভরাট করে গাছ উঁচু করে দিতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে তেউড়ের মূল কলি যেন মাটির নিচে চাপা না পড়ে। সারির দূরত্ব ১.৫-১.৭৫ মিটার এবং গাছের দূরত্ব ০.৫২ মিটার রাখা বিধেয়। বর্ষাকালই বপনের সবচেয়ে ভাল সময়।

পরিচর্যা॥ বপনের আগে অর্থাৎ তেউড় লাগাবার আগে জমি লাঙল এবং বিদে দিয়ে তৈরি করে নিতে হয়। শুকনো আবহাওয়ায় ধারাবাহিক সেচের দরকার। বৃষ্টির চাষে আর শুকনো আবহাওয়ায় ১০দিন অন্তর সেচ দিতে হবে। বপনের ৬ থেকে ১২ মাস পরে পরে দুভাগে হেক্টর প্রতি ২৫-৫০ টন খামারের সার দিতে হবে। রাসায়নিক সার,—হেক্টর প্রতি দেবেন ১১০-১৭০ কিলো নাইট্রোজেন, ১০০-১৭০ কিলো ফস্ফেট, ১৭০-২২০ কিলো পটাশ। সমস্ত সারকে সমান দুভাগে ভাগ করে একভাগ ফুল ফোটার সময় এবং অপর ভাগ বর্ষার সময় লাগাবেন। মুড়ি ফসলের জন্য প্রত্যেকটি গাছের গোড়ায় কেবলমাত্র ১টি তেউড় রাখতে হবে। ফল তোলার পর গাছগুলিতে মাটি চাপা দেওয়া হয়। ফলে মুড়ি ফসলের তেউড়ের শিকড় গজাবে। আনারস চাষ একই জমিতে ৪-৫ বছর রাখা হয় এরপরেই আবার নতুন করে আনারস বাগান তৈরি করতে হবে।

ফল তোলা এবং বিপণন॥ আনারসের ফুল সাধারণতঃ মাঘ-ফাল্গুন থেকে চৈত্র-বৈশাখ মাসে ফোটে এবং ফলে। কোন সময়ে বছরের যে কোনো সময় ফুল আসে ফলে ভাদ্র-আশ্বিন থেকে অগ্রহায়ণ-পৌষ পর্যন্ত ফল পাওয়া যায়। ফল তুলবেন,—যখন দেখবেন ফলের গায়ে স্পষ্ট হলুদ রং, চোখ পুষ্ট এবং মঞ্জরীপত্র শুকিয়ে গেছে। ফলটি প্রায় ৫ সেমিঃ বোঁটা রেখে পরিষ্কার করে কেটে নিতে হবে।

প্রথম বছরে ছোট দুটি প্রকারে ফসল হেক্টর ১২-১৭ টন। কিউ এর ফসল ২৫-৩০ টন। মুড়ি ফসলে উৎপাদন ক্রমেই কমতে থাকে। নিয়মমাফিক

পরিবহনের জন্য খড়-বিচুলি দিয়ে ঢেকে কাঠের বাক্সে বা বাঁশের ঝুড়িতে পাঠানো উচিৎ। কিন্তু কার্যত আমরা দেখি লরিতে খড়-বিচুলির গদির ওপর আনারস লাট দেওয়া হয়। হাটে গঞ্জে 'ডাকে' সর্বোচ্চ ক্রেতাকে বিক্রি করে দেওয়া হয় আনারস।

॥ ফলসা ॥

বেতের দাম অসম্ভব বেড়ে গেছে। অবশ্য সব জিনিসেরই দাম বেড়ে গেছে। বেতের ঝুড়ি আজকাল আর চোখেই পড়ে না। বেতের বদলে আমরা আনায়াসে ফলসার কচি ডাল ছড়ি হিসেবে ব্যবহার করে বেতের অভাব মটাতে পারি।

ফলের বাগান তৈরির একেবারে প্রথমের দিকে ফলসা গাছ লাগিয়ে বাগিচার ফাঁকা ফাঁকা ভাবটা বন্ধ করা যেতে পারে। মাটির এবড়ো-খেবড়ো অবস্থায় জন্মায়ও ভাল। ১০০টি চারা লাগালে ৭৫টি চারা টিকে যায়। গাছ প্রতি ফলসা পাওয়া যায় দুশ গ্রাম। টাটকা ভিটামিন 'সি' ও শ্বেতসার ভরা। কচি ডালে ফুল তথা ফল ধরে বলে সবসময় পুরনো ডাল ছেঁটে ফেলতে হয়। মজা হলো, এই ফেলে দেওয়া, ছেঁটে দেওয়া ডাল দিয়ে গৃহস্থের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ঝুড়ি-চুপড়ি করা যায়।

লিচু (লিচি চাইনেন্‌সিস্ ॥

ব্যবসায়ের জন্য লিচু ॥ যদিও পাশের বিহার রাজ্যে লিচু ভাল হয় কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে এই ফলটার ওপর যথেষ্ট অবজ্ঞা রয়েছে। একটু যত্ন এবং সাথী ফসল হিসেবে পশ্চিবাংলায় লিচুর ভাল চাষ সম্ভব। উত্তর প্রদেশ এবং পাঞ্জাবের তরাই অঞ্চলে খুব সুন্দর লিচু হয়। যতটুকু পশ্চিমবঙ্গে লিচু উৎপাদন হোক না এই ব্যবসাটা এক মাসেই শেষ হয়ে যায়। সমস্ত ভারতব্যাপী লিচুর বেশ ভালো বাজার আছে। আমরা সকলেই আমের কথা জানি কিন্তু আমের ব্যবসায়ের দূর ভবিষ্যতের কথা দূরে থাক, ইতিমধ্যেই কতগুলি অসুবিধা দেখা যাচ্ছে। জনসংখ্যার চাপে অনেক আমবাগান কেটে সাফ করে হয় বসতি বানানো হচ্ছে, নচেৎ কল-কারখানা বসছে। সবার ওপরে রয়েছে আম ফলনের অনিশ্চয়তা। লিচুর অনেক গুণ,—প্রতি বছর আছে ফলনের নিশ্চয়তা, তৈরি দেশি-বিদেশি বাজার, রোগ-বালাই কম এবং স্বাদে-গন্ধে ভরপুর অপূর্ব ফল। অথচ চিন্তা করুন, ১৯৫০ সাল নাগাদ সমস্ত ভারতে চাষ হত ১০,০০০ হেক্টর

জমিতে। আর আজও চাষ হচ্ছে ঠিক সেই পরিমাণ জমিতে। লিচু চাষে নিযুক্ত কিছু চাষীভায়ের সঙ্গে আলোচনা, উৎপাদনে খরচ আয়ের হিসেব-নিকেষ নিচের সারণীতে দেওয়া হলো। হিসেবটায় গাছের ছ-বয়স পর্যন্ত বাজারদর অনুপাতে খরচপত্তর দেওয়া হলো। কারণ এই সময়টাতে লিচু বাজারে নিয়ে বিক্রি করা চলবে। আয়ের হিসেবটা দেখান হল সর্বোচ্চ ডাক নীলামে যে হাঁকচে। এটাই লিচু বিক্রির চিরাচরিত ভারতীয় প্রথা। লিচুর ক্রেতারা গাছ প্রতি ফসল দেখে ডাক দেয়। প্রতিটি গাছে মোটামুটি লিচু হয় ৪০০-৫০০ চার বছর বয়সে, ১৫০০-২০০০ পাঁচ বছরে, ৪০০০-৫০০০ ছ বছরে। পরিপূর্ণ লিচু গাছ ২৪০ টাকা দেয় গাছপিছু, যেখানে ১০০টি লিচুর দাম হচ্ছে ছ'টাকা।

ছ-বছর পরে লিচু বাগানপিছু আয় হয় ১৩,৩৮৫ টাকা, যেখানে খরচ মাত্র ২৩৬৫ টাকা। বাগানের আয়তন মনে করা যাক এক হেক্টর। অর্থাৎ প্রতিটি টাকার পিছনে আয় হচ্ছে ৫·৬৩ টাকা।

লিচুর সাথী ফসল যে টাকা এনে দেয় অন্য কোনো আম বা অন্য কোনো ফলের সাথী ফসল অত টাকা এনে নিতে পারে না। মনে রাখতে হবে সাথী ফসলের খরচটাও হয় কম। আবার লিচুর সব সাথী ফসলই সুন্দর সাড়া দেয়। লিচু চাষের ব্যাপক উদ্যম হয়নি সেটাই রাজেন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি-অর্থনীতি বিভাগ সরেজমিনে তদন্ত করে দেখেছিল। বিভাগের মত হলো :

(১) লিচু চাষী যেখানে পাচ্ছে ৩৮% লাভ, সেখানে দালাল ব্যবসায়ী প্রভৃতি পাচ্ছে ৬২% লাভ। গমের বেলায় ঠিক উল্টো। গম চাষী পাচ্ছে ৭৭.৫০% ভাগ আর বাকিরা ২২.৫০%।

(২) দালাল ব্যবসয়ীকে লিচু বাজারে তুলতে যদিও খরচ হয় ২৫%। কিন্তু সেটা চাষীর লাভ থেকে কাটা পড়ছে। খরচটা হয় লিচু গাড়িচে ওঠাতে নামাতে এবং স্থানান্তরের খরচ।

(৩) বেশির ভাগ লিচুই যায় বড় বড় শহরে, অর্থাৎ কলকাতা-বোম্বে-মাদ্রাজ। অথচ ঐ একই খরচে যদি বিদেশে পাঠানো যায় তবে লাভটা হবে প্রচণ্ড।

(৪) লিচুর ব্যবসাটা খুব কম সময়ের। এক মাসের কারবার। ভিখারীর যেমন বলা উচিৎ নয় আমাকে গম ভিক্ষা না দিয়ে চাল দিন, সেই রকম লিচু চাষী দরদস্তুর করার সময় পায় না। দর দিয়ে মাটি আঁকড়ে বসে থাকলে তার সমস্ত ব্যবসাটাই লাটে উঠবে।

সারণী : ব্যবসায়ে লিচু : বছর পিছু প্রতি হেক্টরে টাকা খরচ

বিষয়	১ম বছর	২য় বছর	৩য় বছর	৪র্থ বছর	৫ম বছর	৬ষ্ঠ বছর
॥ খরচ ॥						
জমি তৈরি	১৬০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০
নালি-বেড়া প্রভৃতি	১০০০	—	—	—	—	—
গর্ত করার খরচ	১৬০	—	—	—	—	—
চারাগাছ লাগানোর খরচ গাড়ি ভাড়া নিয়ে	৬৫০	—	—	—	—	—
সার ও খামারের আবর্জনা	৩৫০	৫০০	৬০০	৮৫০	১,১০০	১২০০
বিবিধ	৪০০	—	—	—	—	—
সেচ	২৫০	২০০	২০০	২৫০	৩০০	৩৫০
ইণ্টারকালচার	২০০	২০০	২০০	২৫০	২৫০	২৫০
গাছ রক্ষার খরচ	১৫০	১৫০	১৫০	১৫০	২০০	২০০
জমির ভাড়া	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০
মূলধনের ওপরে সুদ	৩৩৭	১২০	১৩০	১৬৫	২০০	২১৫
মোট	৩,৭০৭	১৭২০	১৪৩০	১৮১৫	২২০০	২৩৬৫
॥ আয় ॥						
সাথী ফসলের থেকে	১৫০০	১০০০	১০০০	৭৫০	—	—
লিচু থেকে	—	—	—	১৪০০ থেকে ১৭৫০	৫২৫০ থেকে ৭০০০	১৪০০০ থেকে ১৭৫০০
মোট	১৫০০	১০০০	১০০০	২১৫০ থেকে ২৫০০	৫২৫০ থেকে ৭০০০	১৪০০০ থেকে ১৭৫০০
নীট আয়	২২০৭	—৭২০	—৪৩০	৩৮৫ থেকে ৬৮৫	৩০৫০ থেকে ৪৮০০	১৯৬৩৫ থেকে ১৫১৩৫

ওপরের সমস্যাগুলি প্রতিবিধান করতে নিচের উপায়গুলি নিতে হবে :—

(১) চাষী ভাইদের ভালমতো ব্যাঙ্ক ঋণ বা অনুরূপ কোনো অনুদান দিতে হবে যাতে তারা দালাল মধ্যমণির খপ্পরে গিয়ে না পড়ে। এ ধরনের সাহায্য পেলে তারা দুঃসময়ে অন্যের কাছে হাত পাতবে না।

(২) নতুন ধরনের লিচু প্রজাতির প্রকার (ভ্যারাইটি) বের করতে হবে। অর্থাৎ এমন ধরনের লিচু বের করতে হবে যা লিচুর সময়কাল বাড়িয়ে দেবে এবং পাকতেও সময় নেবে বেশি।

(৩) লিচু সংরক্ষণের নতুন ভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে হবে।

॥ সংক্ষেপে লিচুর চাষ ॥

বালি দো-আঁশ এবং মেটেল মাটি যেখানে প্রচুর চূণ রয়েছে বা সস্তায় চূণ লাগানো সম্ভব সেখানেই লিচু উৎপাদন সম্ভব। নদীয়া জেলায় প্রচুর গরম হাওয়া মাঝে মাঝে উত্তরপ্রদেশের 'লু'র মত বয়। এটা আটকালে লিচুর ফলন এবং স্বাদ আরও ভাল হয়।

লিচুর প্রকার ॥ বিহারের অনুমোদিত প্রকার যেগুলি পশ্চিমবাংলায় উপযুক্ত আবহাওয়ায় চাষ সম্ভব, সেগুলি হল,—চীনা, পূর্বী, দেশি বেদানা, এবং ডেরা রোজ। উত্তর প্রদেশের—রোজসেনটেড্, আর্লি লাজ রেড্, কলকাতিয়া, গুলাবি, লেট সিডলেস্ এবং পশ্চিমবাংলার চীনা এবং মজফরপুর।

বিস্তার এবং বপন ॥ মাটির ওপর গুটি হচ্ছে প্রধান পদ্ধতি। আসন্ন কলম, কলি বসান, এবং জোড় কলম করাও চলে। বর্ষাকালে ও বছরের পুরান গুটি বা চারা ৯ মিটার অন্তর গর্তে বসানো হয়।

ছাঁটাই ॥ যেহেতু আগের বছরের গজানো ডালপালায় ফল ধরে সেহেতু ফল পাড়ার সময় সাধারণতঃ আন্দাজ মত ডাল ভেংগে দেওয়া হয়। এটাই হল দরকারি ছাঁটাইয়ের কাজ।

পরিচর্যা ॥ চারাগাছকে বেড়া দিয়ে রক্ষা করতে হবে। আগাছা হলেই তাড়াতে হবে। পৌষ-মাঘ থেকে ফল তোলা পর্যন্ত সেচ দিতে হবে। খামারের সার ছাড়াও নাইট্রোজেন ফসফোরাস্—পটাশের জন্য মিশ্রসার দিতে হবে। জমিতে চূণের অভাব থাকলে চূণ দিতে হবে।

ফল তোলা ॥ গাছ থেকে ভালভাবে ফল পাড়তে হবে। পূর্ণবয়স্ক গাছ (৬ বছরে) ১১০ কিলো লিচু দেয়।

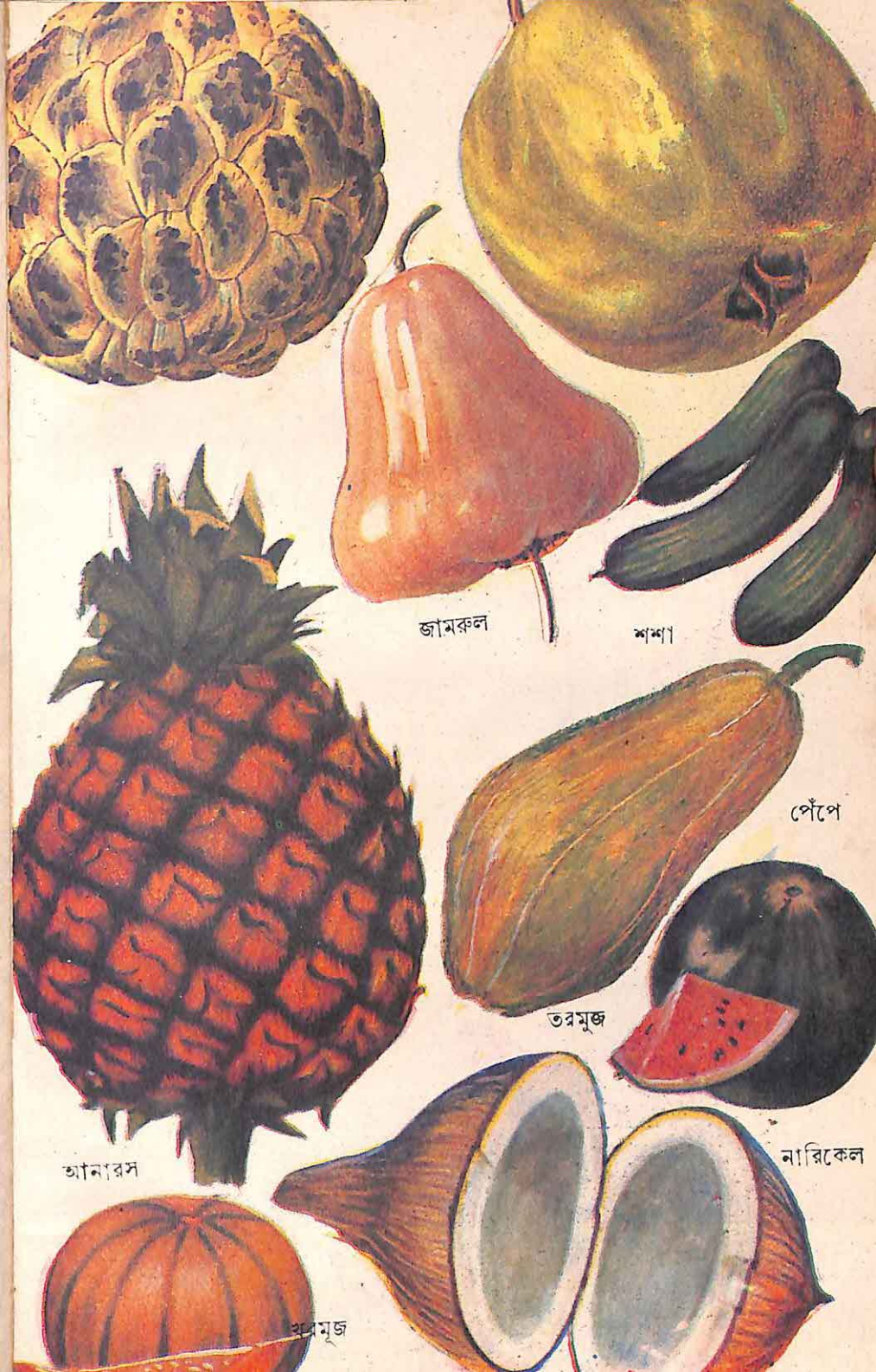
জামরুল
শশা
পেঁপে
তরমুজ
আনারস
নারিকেল
খরমুজ

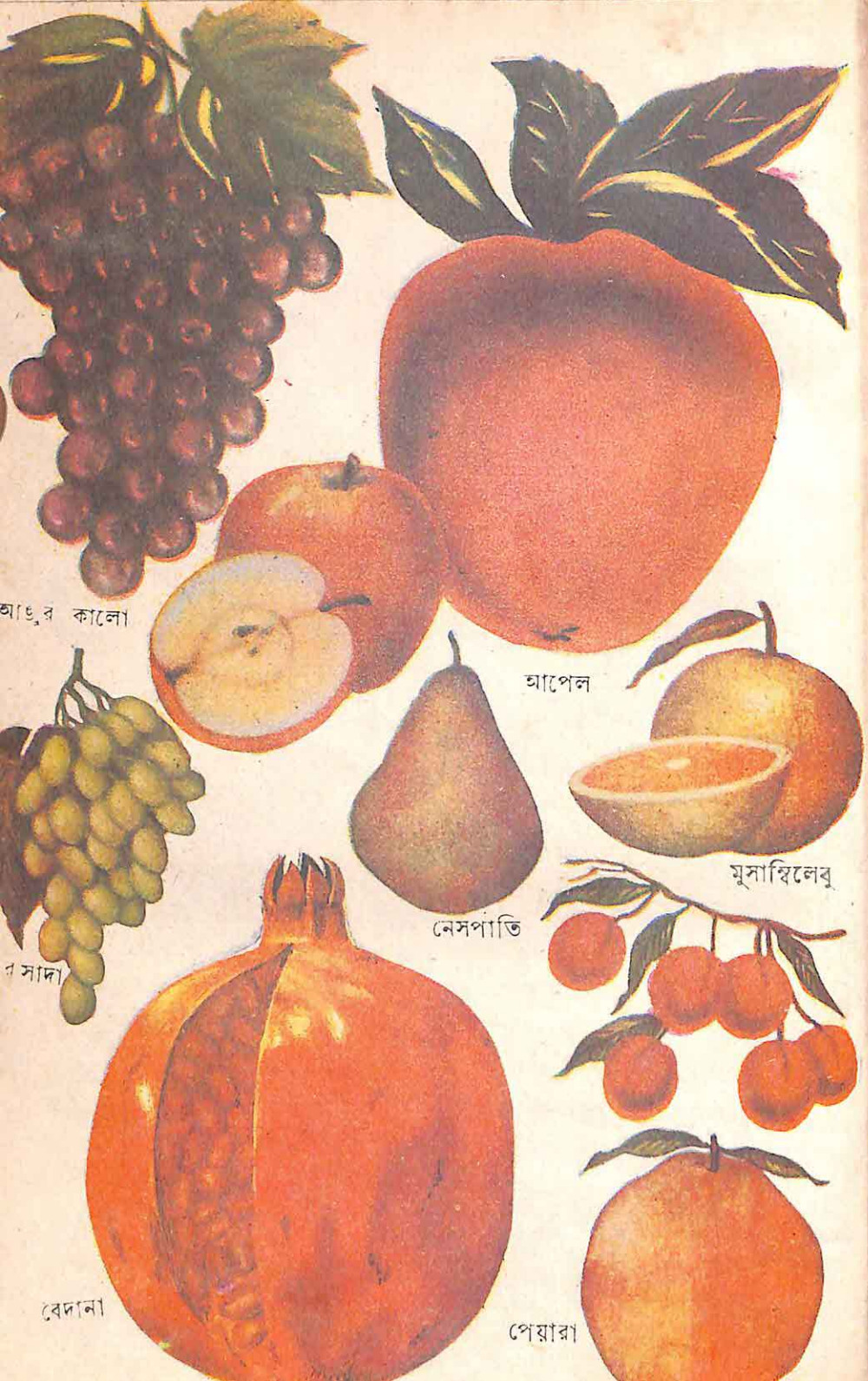
আঙুর কালো
আপেল
মুসাম্বিলেবু
নেসপাতি
সাদা
বেদানা
পেয়ারা

॥ স্ট্রবেরি (ফ্রাগারিয়া প্রজাতি) ॥

বিদেশে স্ট্রবেরি প্রচুর চলে। ভারতের স্ট্রবেরি বিদেশে চালান হয়ে পর্যাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা আনে। তাই এই ফলটির চাষে ব্যবসায়ের সম্ভাবনা অপরিসীম। সমস্ত প্রজাতিগুলিই বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়েছে। নিচের প্রকারগুলি পশ্চিমবঙ্গে উপযুক্ত ব্যবস্থায় চাষ সম্ভব ; ল্যাক্সটন্স লেটেস্ট, রয়াল সভরিন, আর্লি কেমব্রিজ, হাক্সলে জায়েণ্ট।

॥ **বিস্তার এবং বপন** ॥ কুমারী গাছ অর্থাৎ নিষ্ফলা গাছ জমিতে বপন বা লাগানোর জন্য ব্যবহার করতে হবে। সারির দূরত্ব ০·৭৫—১ মিটার এবং গাছের দূরত্ব ০·৫ মিটারে রাখা হয়। নতুন বাগান করতে যে-সব 'রানার' বা কুমারী গাছে ভাল শিকড় ব্যবস্থা আছে তাই বেছে নিতে হবে। পাহাড়ী জায়গায় চৈত্র মাসে এবং সমতল জায়গায় মাঘ মাসে গাছ লাগাতে হয়।

॥ **কৃষ্টি-পরিচর্যা** ॥ গভীরভাবে লাঙল এবং বিদে দিয়ে জমি তৈরি করতে হয়। গোবর সার ব্যবহার করতে হবে। আগাছা নিয়ন্ত্রণে হালকাভাবে বিদে দিতে হবে। যখনই রানার চোখে পড়বে তখনই তুলে ফেলতে হবে। শীতের মাসগুলিতে সার প্রয়োগ করা হয়। বসন্তে গাছে ফুল ফুটলে বাগিচায় খড় বিছিয়ে দিতে হবে। সাবধান হতে হবে, ফলগুলি মাটিতে লেগে না যায়। ফল ধরার পর খড় এবং আগাছা উঠিয়ে ফেলতে হবে, এবং সমস্ত 'রানার' কেটে সরিয়ে দিতে হবে। বিদে দেবার কাজ সমানে চালিয়ে যেতে হবে। প্রতি ৩ বছর অন্তর স্ট্রবেরির সঙ্গে পর্য্যায়ক্রমে সবজি চাষ করতে হবে।

॥ **পীচ্ ফলের ব্যবসায়ে নানান দিক** ॥

পীচের সঙ্গে রবি এবং খরিফকালীন চাষ সম্ভব। শীতকালে পীচ গাছে পাতা ঝরে যায় বলে সহজেই রবিকালীন চাষ চলে। যেহেতু গাছগুলি রবিশস্যে ছায়া দেয় না, উপরন্তু শীতকালে গাছগুলি অকেজো বলে, গাছের পাতা, ডালপালা ছাঁটাই প্রভৃতি থেকে গাছপ্রতি ১০-১৫ কেজি জ্বালানি পাওয়া যায়। একটি পাঁচ বছরের গাছ থেকে বছরে দশ কেজির মত পাতা পাওয়া যায় শুধু নভেম্বর-ডিসেম্বরে। এই পাতাই আবার সার হয়ে গাছের কাজে আসবে। এক হেক্টরে পাতা থেকে সার পাওয়া যাবে—৩৪ কেজি নাইট্রোজেন, ৮ কেজি ফসফরাস, ২৫ কেজি পটাশ এবং ১৫ কেজি ক্যালশিয়াম প্রতি বছরে। বাগানে পীচ লাগাবার দ্বিতীয় বছরে রাইজোম

জাতীয় গাছ লাগাতে হয় সাথী-ফসল হিসেবে। রাইজোম গাছগুলির মধ্যে আদার থেকে হলুদের কার্যকারিতা বেশি। হলুদ জন্মাবে হেক্টর প্রতি ৭৪৫০ কেজি। সিম লাগালে ৫ বছর পর্যন্ত সমানে ফসল দিয়ে যাবে।

॥ পীচ্ ফলের অর্থনৈতিক দিক ॥

রাইজোমের গাছগুলি অর্থাৎ আদা এবং হলুদ সারা বছরে হেক্টর প্রতি পাওয়া যাবে যথাক্রমে ২৫০০ টাকা এবং ১৫০০ টাকা। ব্যবসায়িক ভাবে পীচ্ ফল থেকে লাভ আরম্ভ হয় গাছের যখন পাঁচ বছর বয়স। ফ্লোরডাসাম্ পীচ বাগিচা থেকে এক বছরে এক হেক্টরে ৬৫০০ টাকা পাওয়া যার। যখন গাছের বয়স ৬ বছর। নাম্বিয়ার ১৯৭৫ সালে পর্য্যালোচনা করে দেখেছেন পীচ গাছের সংগে সাথী-ফসল হলুদ দেয় ৫৫৬৩ টাকা, আদা ১১০২৪ টাকা, সয়াবিন ২৭০৪ টাকা, মেস্থা ২৪৩০ টাকা, গোমুখ ৩১২ টাকা হেক্টর প্রতি।

॥ ব্যবসায়ের উপযোগী কয়েকটি ফুল ॥

॥ রজনীগন্ধা (পলিয়েনথিস্ টিউবার রোজ) ॥

ব্যবসায়ের উপযোগী ফুলের কথা বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হবে রজনীগন্ধার কথা। পশ্চিমবাংলায় প্রায় সব রকম মাটিতে চাষ সম্ভব। শক্ত ডাঁটি অনেক কাজে ব্যবহার হয়। মানুষের ঘরের টেবিল থেকে আরম্ভ করে পূজায়, বিয়েতে কনে সাজাতে, গাড়ি-খাট-পালঙ্ক-গয়নাগাঁটি সব কিছু। গরীব যে, যার নেই কোন সংগতি সে অনায়াসে খুব বড়লোকের বাড়িতেও কয়েকটি রজনীগন্ধার ডাঁটি নিয়ে বিন্দুমাত্র সংকোচ না করে হাজির হতে পারে। শুধুমাত্র রজনীগন্ধা দিয়ে সম্পূর্ণ ফুলসজ্জা সম্ভব। রজনীগন্ধা ফুলের গুণ অনেক,—(১) অনেকদিন এই ফুল রাখা যায়, (২) ডাঁটা শক্ত, ফলে দেশ-বিদেশে পাঠানো চলে, (৩) মোমের মত শ্বেতশুভ্র ভাব, (৪) সুন্দর গন্ধ, (৫) এই ফুলের সুগন্ধি তেল বের করে নানা কাজে ব্যবহার করা চলে। দক্ষিণ ভারতে,—বিশেষ করে বাঙ্গালোরে এ নিয়ে কাজ চলছে। ফরাসি দেশে এবং মরক্কোয় রজনীগন্ধা থেকে সুন্দর সুন্দর সেণ্ট বা এসেন্স তৈরি হচ্ছে।

মেদিনীপুর জেলায় কোলাঘাটে এক সময় একপেশে রজনীগন্ধা ফুলের চাষ

হত। এর চাষ ছিল ঐ অঞ্চলের কিছু চাষী ভাইদের একচেটিয়া। আজ সেই রজনীগন্ধার চাষ তাদের হাতছাড়া হয়ে গেছে। তবু নিঃসন্দেহে বলা চলে আজও কোলাঘাটের রজনীগন্ধা সবার সেরা। যে কোন অঞ্চলের ফুল থেকে ২ থেকে ৫ টাকা বেশি দামে বিকোয়। এখন রজনীগন্ধা ব্যাপক চাষ হয়,—মেদিনীপুর, নদীয়া, ২৪ পরগনা ও বর্ধমানে। নদীয়া জেলায় অনেক ধান গমের চাষী চিরাচরিত প্রথা ছেড়ে এখন রজনীগন্ধা চাষের দিকে ঝুঁকেছে। লাভও পাচ্ছে। নদীয়া জেলার পূর্ণনগর (রাণাঘাট)-ফুলিয়া-হরিণঘাটা-হাঁসখালি-শান্তিপুর-কৃষ্ণনগরে ব্যাপক রজনীগন্ধার চাষ হচ্ছে। এই জেলায় ১২০০ হেক্টর জমি রজনীগন্ধার আওতায় এসেছে।

প্রকার ॥ মোট দু'ধরনের রজনীগন্ধা আছে,—(ক) বামন প্রকৃতির এবং (খ) ভেরিগেটা বা অন্যরূপী। সাধারণতঃ পাপড়ি হয় দু'ধরনের—একসারি ও দু'সারি। একসারি পাপড়ি রজনীগন্ধা লোকে পছন্দ করে বেশি। চাষও ভাল হয়। একসারি পাপড়ির ফুল থেকে সুগন্ধী নির্যাস (এসেনশিয়াল অয়েলস্) তৈরি হয় ভালো।

রজনীগন্ধার চাষ ॥ নদীয়ার মাটি মেদিনীপুরের কোলাঘাটের মাটি থেকে আলাদা। নদীয়া জেলার মাটি হালকা আর আলগা—সাধারণতঃ বালি দোআঁশ। মাটি তৈরি করতে পাঁচ-ছটা লাঙ্গল চালিয়ে আর মই দিয়ে জমি সমান করতে হয়। মাটি হওয়া চাই মোটামুটি উর্বরা। সার দিতে হবে,—১৫ থেকে ২০ (কুড়ি) গাড়ি খামার সার, ১০ কুইন্টাল বাদাম-সর্ষের খোল, ৩৫০ কেজি সুফলা (১৫ : ১৫ : ১৫) প্রতি হেক্টরে যোগান দিতে হবে। মে মাসে অর্থাৎ গেঁড় লাগাবার ৪০ দিন পরে আবার সুফলা দিতে হবে ৩৫০ কেজি ঐ হেক্টর প্রতি। প্রতি বছর হেক্টর প্রতি ঐ পরিমাণ সুফলা যোগ করতে হবে ঐ সমান পরিমাণ জমিতে। ব্যাপারটা চলবে তিন বছর ধরে। তারপর ফুল কমে আসতে আরম্ভ করলে,—জমি কেঁচে গণ্ডুষ করে নতুন করে চাষ আরম্ভ করতে হবে। দেখা গেছে, সার লাগালে গাছে খুব তাড়াতাড়ি ফুল আনা যায়।

ফুলের চাহিদা সারা বছর থাকলেও সাধারণতঃ দেখা যায় এপ্রিল থেকে জানুয়ারি মাসে রজনীগন্ধার চাহিদা যায় বেড়ে। তাই নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে ৮০ থেকে ১০০ কেজি হেক্টর প্রতি ওপরের বলা সুফলা জমিতে দিলে ফুলটার ফলন বেড়ে যায়।

মজার জিনিস হল,—কোলাঘাটে সার কম ব্যবহার করা হয়। যে সার ব্যবহার করা হয় তা ওখানকার খামারের সার আর খোল। আবার এটাও দেখা গেছে কোলাঘাটের ফুল নদীয়া জেলার ফুল থেকে অনেকদিন বেশি টাটকা রাখা যায়। কারণটা কি তাহলে কোলাঘাট জৈবসার (খামার সার, গোবর সার-খোল প্রভৃতি) ব্যবহার করছে বলে ? কাজেই কোলাঘাটের ফুল যে বাজারে বেশি পয়সা আনবে এতে আশ্চর্য কি ?

বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, মোহনপুর, নদীয়ার অনুমোদন হল নাইট্রোজেন-ফসফোরিক অ্যাসিড বা ফসফোরাস্-পটাশ যথাক্রমে ২০-৩০-২০ গ্রাম করে। সারগুলি দিতে হবে প্রতি বর্গমিটারে।

॥ **কীভাবে গেঁড় বা বাল্ব লাগাতে হবে** ॥ ৩০ সেমিঃ বা ১২ ইঞ্চি ব্যবধানে পর পর গেঁড় লাগিয়ে যেতে হবে লাইন করে। দু'লাইন বা এক এক সারের মধ্যে ফাঁক থাকবে ৩০ সেমিঃ। কিন্তু চতুর্থ আর পঞ্চম সার বা লাইনের মধ্যে ফাঁক থাকবে ৪৫ সেমিঃ বা ১৮ ইঞ্চি। ১৮ ইঞ্চি ফাঁক হল ফুল তোলার জন্য। মাটির কতটা নিচে গেঁড় পুঁতবেন সেটা নির্ভর করবে গেঁড়ের আয়তনের ওপর। গেঁড় যত বড় হবে,—গর্তের আয়তনও তত বেশি হবে। সাধারণতঃ গর্ত হয় ৩·৫ সেমিঃ থেকে ৬ সেমিঃ। মার্চ-এপ্রিল মাসে ভিজে মাটিতে গেঁড় পুঁততে হয়। সাধারণতঃ ১২০০ থেকে ১৫০০ কেজি গেঁড় লাগে এক হেক্টর জমিতে। গেঁড় থেকে পাতা না বের হওয়া পর্যন্ত সেচের কোন দরকার হয় না। গাছের পাতা বের হলেই হাল্কা সেচ দিতে হবে। কখনই অতিরিক্ত সেচ দেওয়া উচিৎ নয়।

॥ **ফুল তোলা** ॥ গেঁড় লাগাবার ৮০ থেকে ১০০ দিন পরে অর্থাৎ জুলাই মাসে ফুল তোলা আরম্ভ হয়। সবচেয়ে বেশি ফলন হয় ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল মাসে যদিও রজনীগন্ধা সারা বছরই ফুল দিতে অভ্যস্ত। প্রতিটি ফুল আলাদা আলাদা তোলা হয়। ফুল তোলার কাজে শিশু-শ্রমিক নিয়োগ করা হয়। এক কেজি ফুল তোলার জন্য ৩৫ পয়সা দেওয়া হয়। বাঁশের ঝুড়িতে আলগাভাবে ফুল ভর্তি করা হয়। প্রতি ঝুড়িতে ধরে ১০-১৫ কেজি ফুল।

ফুলসজ্জায় রজনীগন্ধার ডাঁটি (স্টিক্) ব্যবহার করা হয়। ১০০টি রজনীগন্ধার ডাঁটি দিয়ে বাণ্ডিল তৈরি হয়। প্রথম বছরে রজনীগন্ধার বাগান থেকে হেক্টর প্রতি পাওয়া যায় ১৫০-২০০ ক্যুইণ্টাল ফুল। দ্বিতীয় বছরে ২০০-২৫০ ক্যুইণ্টাল। কিন্তু তৃতীয় বছরে মোটে ৭৫-১০০ ক্যুইণ্টাল।

কাটা ফুল মরসুমের সময় কোথাও কোথাও বিক্রি হয় (বিশেষ করে কলকাতায়) ৩ টাকা থেকে ৮০ টাকা কেজি দরে। ১০০টি রজনীগন্ধা ডাঁটির বাণ্ডিলের দাম ৮ থেকে ১৫ টাকা।

তিন বছর পর মাটি খুঁড়ে গেঁড়ের গুচ্ছ বের করা হয়। প্রতিটি গুচ্ছ থেকে ২০-২৫টা গেঁড় পাওয়া যায়। ওর ভেতর ৮-১০টি গুচ্ছ বেশ বড় আকারের। গেঁড় বিক্রি করেও টাকা রোজগার সম্ভব।

॥ **রোগ-মড়ক** ॥ কোনো মারাত্মক রোগ রজনীগন্ধার নেই, শুধু সেলেরোটিয়াম্ রোলসিআই ছাড়া। রোগাক্রান্ত রজনীগন্ধা সরিয়ে ফেলতে হবে। রোগ দমনের জন্য ০·২৫% কাপটান (Captan) ছিটিয়ে দিতে হবে। অতিরিক্ত সেচ বন্ধ করতে হবে। এপিড্ (Aphids), ম্যালাথিওন (০·২৫%) ছিটিয়ে ধ্বংস করতে হবে। পশ্চিমবংগে যুদ্ধকালীন অবস্থা বিচারে রজনীগন্ধা থেকে তেল বের করার কথা চিন্তা করতে হবে। তাহলে বেকার ভায়েদের রোজগারের একটা আয় যাবে খুলে।

॥ পদ্ম (নিলামবিয়াম্ নুসিফেরা) ॥

ফুল চাষের গোড়ায় একটু ভুল হয়ে গেছে। আমি ভারতের জাতীয় ফুল গাছের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। হ্যাঁ, পদ্ম আমাদের জাতীয় ফুল। পবিত্র রূপকথা-ধর্ম-গ্রন্থ-মহাকাব্যে-ঐতিহাসিক প্রাসাদে সর্ব জায়গাই পদ্ম ছড়িয়ে আছে। অজন্তা ইলোরার দেওয়াল চিত্রে, মন্দিরের ভাস্কর্যে পদ্ম-ছাড়া যেন সবকিছুই অচল। বস্ত্রশিল্পে, মৃৎকর্মে, সংগীতে এমন কি নাচে পর্যন্ত পদ্ম—তার মহান স্থান করে নিয়েছে।

হিন্দুদের ধর্ম-উপকথায় (৫০০-৬০০ খ্রীষ্টাব্দ) বলা হচ্ছে পদ্ম বিষ্ণুর নাভিমূল থেকে উঠে এসেছে। আরেকটি ধর্মকথায় বলা হয়েছে মহিষাসুর দমনে দুর্গা ঠাকুরকে যখন নানা অস্ত্রে সাজান হয় তখন সেই অস্ত্রের মধ্যে পদ্মও স্থান পায়। পদ্ম দিয়ে সাজান জলের দেবতা বরুণ। দেবতাদের কাছে পদ্ম অতি আদরণীয়। দেবতা বিষ্ণুর হাতে পর্যন্ত একটা পদ্ম উঠেছে। লক্ষ্মী-সরস্বতী সকলের সঙ্গেই পদ্ম জড়িয়ে। পশ্চিমবাংলায় ১০৮টি পদ্মফুল ছাড়া দুর্গাপূজা হবে না। পদ্মের নামও কত—কোকনদ, পঙ্কজ, কমল প্রভৃতি। ভারত সরকারের বেসরকারি শ্রেষ্ঠ ছায়াছবির জন্য পুরস্কার দেওয়া হয় স্বর্ণ কমল। পদ্মের সঙ্গে তুলনা করা হয় মানুষের চোখের, মুখের, মনের, হৃদয়ের—এক কথায় মানুষের যা কিছু ভালো তার সঙ্গে।

প্রাগৈতিহাসিক যুগে দ্রাবিড়-রা পদ্মফুল খেত। ঋক্‌বেদেও খাবার হিসেবে পদ্মের উল্লেখ আছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে উল্লেখ আছে কোন চন্দন গাছে পদ্মের মতো গন্ধ হয়। বুদ্ধদেবের অনেক মূর্তিতে দেখা যায় তিনি পদ্মের ওপর বসে আছেন। পদ্মের নানা রং—লাল, গোলাপি, সাদা। আমেরিকায় একটা পদ্ম (নেলাম্বু লেটিয়া) আছে যার রং হলদে।

পদ্মের সবকিছুই খাওয়া হয়—পাতা-ফুল-বীজ-মধু। পদ্মমধু, অনেকে দাবি করেন, অন্ধের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেয়।

॥ **পদ্মফুলের চাষ** ॥ অথচ দেখুন এই পদ্মফুলের আজ কি অনাদর। একমাত্র পূজার সময় ছাড়া এর কথা আমাদের মনেই পড়ে না। পদ্মফুল দিয়ে সুন্দর ঘরবাড়ি-টেবিল মঞ্চ সাজানো যায়। গন্ধও পদ্মফুলের চমৎকার।

অনেকে বলেন পদ্মফুলে মশা হয়। জলে জঞ্জাল জমে। এটা আজ আর কোনো সমস্যা নয়। পদ্ম বন এবং মশা আর জলজ কীট সহজেই ঘেসো রুই চাষ করে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

॥ **প্রকার** ॥ আমেরিকান হলদে পদ্ম নিলাম্বু লেটিয়া, ভিক্টোরিয়া লেজিয়া প্রভৃতি। দু'ধরনের পদ্মফুল আছে—অর্থাৎ এক সারির পাপড়ি পদ্ম আর দু'সারির পাপড়ির পদ্ম।

পদ্মের জন্য তিন হাত জল হলে যে কোন জলাশয় চলবে। জলের নিচেই থাকবে হাত খানেক সারমাটি। গ্রামের দিকে পরিত্যক্ত ইটভাঁটার খালি গর্ত-গুলি সহজেই পদ্ম চাষের জন্য ব্যবহার করা চলে। এবং পদ্ম গাছকে নিয়ন্ত্রণের জন্য থাকবে ঘেসো রুই। বাজার থাকলে ৬ কাঠা জমির ওপর কংক্রিটের জলাধার তৈরি করে চাষ সম্ভব। খেয়াল থাকে যেন জল চুইয়ে বাইরে না বেরিয়ে পড়ে। অবশ্যই জলাধারের পাশগুলি জমি থেকে ফুট দেড়েক উঁচু হবে। জলাধারের পাশের যে কোন একটি জায়গায় একটা ফুটো রাখবেন—নাহলে বর্ষাকালে জল বেড়ে গিয়ে পদ্মের ক্ষতি করবে আর মাছ চাষ করলে মাছও ভাসা জলের সঙ্গে যাবে বেরিয়ে। কৃত্রিম ঐ জলাধারটা হবে—খোলামেলা জায়গায় যেখানে প্রচুর রোদ পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে এটাও খেয়াল রাখতে হবে যেন আশপাশের গাছপালা থেকে ঝরা পাতা জলাধারে না জোটে।

বিঃ দ্রঃ উৎসাহী পাঠকদের লেখকের "মৎস ও ব্যবসায়ে মৎস্য" পাঠ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। প্রকাশক "শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী" ৭৯, মহাত্মা গান্ধী, রোড্ কলকাতা—৭০০ ০০৯।

একই জলাধারে পদ্ম শালুক বা পদ্মের বিভিন্ন প্রজাতির চাষ করবেন না। কারণ সবল প্রজাতি দুর্বল প্রজাতির পদ্মগাছ মেরে ফেলে।

॥ **কৃষ্টি-পরিচর্যা প্রভৃতি** ॥ বীজ থেকে পদ্মগাছ তুলতে প্রচুর সময় লাগে, তাই পদ্মের কোঁড় বা গেঁড়ি জোগাড় করে লাগান ভাল। পদ্মের জন্য সার মাটি হবে, সাত ভাগ পাঁকমাটি বা সাধারণ দো-আঁশ মাটি, জমা গোবর এক ভাগ। এর সঙ্গে দেবেন ১০০ গ্রাম হাড়ের গুঁড়ো। এ ধরনের সারমাটিতে পদ্ম গাছ লাগিয়ে এমনভাবে জল দিতে হবে যাতে পদ্ম পাতা ঠিক জলের ওপর ভেসে থাকে। পাতার ডাঁটি লম্বা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জলের পরিমাণও অবশ্যই বেড়ে যাবে। জল পাতার ওপর উঠে গেলে গাছের ক্ষতি।

বর্ষকাল পদ্মগাছ লাগাবার উপযুক্ত সময়। গাছের সংখ্যা বেশি হয়ে গেলে গাছ সরিয়ে অন্য জলাধারে লাগান চলবে। পুরানো গাছের বেলায়ও সার দিতে হবে, পরিমাণ মত গোবরসার আর হাড়ের গুঁড়ো। দু-তিন বছরে একবার গাছ পাল্টানো দরকার। কোঁড় বা গেঁড়ির জন্য যোগাযোগ করতে পারেন। (১) জনসংযোগ দপ্তর বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, পোঃ মোহনপুর, নদীয়া এবং (২) হর্টিক্যালচারাল ইনস্টিটিউট, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

॥ গ্লাডিওলাস ॥

এককালে আমার ধারণা ছিল গ্লাডিওলাস্ ফুল বোধহয় সাগর পাড়ের মানুষ আর সাগর পাড়ের লোকদের সঙ্গে যুক্ত পয়সাওয়ালা ভারতীয় ছাড়া আর কেউ ঐ ফুলটার আদর বোঝে না। ভুলটা ভাঙ্গল এক শীতে। কলকাতার বেশ কয়টি জায়গায় যেমন বেলেঘাটায় ফুলবাগানের আশেপাশে, চারু মারকেটে (টালিগঞ্জ), নিউ আলিপুর, গোলপার্ক প্রভৃতি জায়গায় ফুটপাথে বসে গোলাপ-রজনীগন্ধার সঙ্গে গ্লাডিওলাস্ ফুল বিক্রি হতে দেখে। অনেক ফুল-চাষি ভাইয়ের নিউমার্কেট-এ বাঁধা দোকানদার আছে শুধুমাত্র গ্লাডিওলাস্ ফুলের জন্য। যেভাবে গ্লাডিওলাসের প্রকার বেড়ে যাচ্ছে,—আশা আছে একসময় গ্রামের গরিব মানুষও রুচির তাগিদে রজনীগন্ধার মত গ্লাডিওলাস্ ডাঁটি (স্টিক) কিনবে। দুটিরই শক্ত ডাঁটি কুঁড়ি দেখে কিনলে অনেকদিন ঘরে রাখা যায়।

পশ্চিমবাংলার গ্লাডিওলাস্ ফুল চাষিরা প্রচুর পয়সা পাচ্ছেন এই ফুল থেকে। ভরসা হচ্ছে সরকারি উৎসাহ পেলে আমাদের চাষি ভায়েরা বিদেশে এই ফুলটি রপ্তানি করে ভাল পয়সা পাবেন।

॥ **প্রকার** ॥ বিভিন্ন রং আর প্রকৃতির জন্য নিত্য নতুন প্রকার বেরচ্ছে গ্লাডিওলাসের। নিচে পশ্চিমবঙ্গে চাষ উপযোগী কয়েকটি প্রকারের উল্লেখ করা হল।

(১) **সাতনা** ॥ এটা তৈরি হচ্ছে সবুজ উড্‌পেক থেকে অর্থাৎ নেপলস্ হলুদ রং (১১ বি) এর সঙ্গে পারপেল্ ব্লচ্ (৬১ বি) × ফ্রেণ্ডশিপ্ স্পাইনেল্ লাল (৫৪ সি) এর সঙ্গে হলুদ (১৩ ডি) ব্লচ।

(২) **জি. পি. আই** ॥ স্নো-হোয়াইট্ × ফ্রেণ্ডশিপ্।

(৩) **নজরানা** ॥ এই উন্নত প্রজাতি বা হাইব্রিড্ তৈরি হচ্ছে ব্ল্যাক্ জ্যাক্ (ক্রিসেনথিমাম্) ক্রিমসন্ (১৮৫এ) × ফ্রেণ্ডশিপ্।

(৪) **পুনম** ॥ এই প্রকার তৈরি হচ্ছে,—জেলিবার হেরাল্ড [মিমোসা হলুদ রংয়ের (৮ বি) × আর. এন. ১২১ (হাল্কা পারপেল্ (৭৬ সি) সাদা ব্লচ্।]

(৫) ॥ **অপ্সরা** ॥ উন্নত প্রজাতি তৈরি হবে ব্ল্যাক্ জ্যাক্ (ক্রিসেনথিমাম্ ক্রিমসন্ (১৮৫ এ) × ফ্রেন্ডশিপ্ লাল স্পাইনেল (৫৪ সি) সঙ্গে আছে হলুদ (13D) থ্রট্]।

(৬) **আরতি** ॥ তৈরি হচ্ছে সারলি [ভারমিলিওন (৪১ এ) সঙ্গে আছে হলুদ বেরিয়াম (১০ বি) ব্লচ্—রক্তলাল ষ্ট্রিক্] এবং মেলোডি (স্পাইনেল রেড (৫৪ সি) সঙ্গে থাকছে ইণ্ডিয়ান ইয়েলো (১৭ ডি) স্কারলেট্ (৪৩ বি) ব্লচ্।

মিউটেশন্ প্রক্রিয়ায় জনন করে বিভিন্ন উন্নত জাতের (হাইব্রিড্) গ্লাডিওলাস্ গাছ জন্মানো সম্ভব হয়েছে।

(৭) ॥ **শোভা** ॥ ওয়াইল্ড্ রোজ-এ মিউটেশন্ ঘটিয়ে 'শোভা' তৈরি হয়েছে।

॥ **চাষ** ॥ ভয় পাবার কিছু নেই, ফুলটা চাষ করতে আহামরি গোছের মাটি লাগে না। রোদে ভরা খোলামেলা জায়গায় জল নিকাশি ব্যবস্থা আছে এমন মাটিতে গ্লাডিওলাস্ চাষ সম্ভব। মাটি হবে বেলে দো-আঁশ, প্রশম যার ৬-৭ (PH)। মাটি ভাল করে খুঁড়তে হবে। জমি তৈরি হবে ভালভাবে পচা খামারের সার (প্রতিবর্গ মিটারে ৬-৭ কেজি) দিয়ে। নেমাটোড (কীট) এবং মিলি পতঙ্গের দমনের জন্য দিতে হবে মাটিতে ২.৫ গ্রাম ফুরাদান [Furadan (ইংরাজি 'লন') granules] ওষুধ।

গেঁড় লাগাবার সবচেয়ে ভাল সময় জুন মাস। ফলন ভাল পাওয়া যায়

অক্টোবর-নভেম্বর মাসে। দুবছরের পুরানো গেঁড় অর্থাৎ গেঁড় থেকে জন্মান গেঁড়েই ভাল ফুল পাওয়া যায়। মাটি থেকে গেঁড় তোলার পর ২-৩ মাস নিষ্ক্রিয় থাকে (ডরম্যাণ্ট্)।

গেঁড় থেকে শিকড় বের হলে বুঝতে হবে, বপন করার সময় এসেছে। অবশ্যই মাটি ভিজে থাকবে গেঁড় লাগাবার সময়। গেঁড় লাগাবার আগে গেঁড়গুলি ০·২% বেনলেট্ জলে চুবিয়ে নিতে হবে যাতে ফুজারিয়াম্ রোগ না হয়। ফুজারিয়াম্ রোগ মাটি থেকেই ছড়ায়। সুতরাং কোনো জমিতেই পরপর তিনবারের বেশি গ্লাডিওলাস্ ফুল চাষ করা উচিৎ নয়। ৫ সেমিঃ গর্ত করে ২০ সেমিঃ×২০ সেমিঃ দূরে দূরে গেঁড় বসাতে হবে। গেঁড় বসাবার সঙ্গে সঙ্গে সেচের দরকার নেই। মাটির ওপরে পাতা (স্প্রাউট্) আসার সময় হালকা সেচ দেওয়া ভাল। স্বাভাবিক অবস্থায় সপ্তাহে একবার সেচ এবং আগাছা পরিষ্কার করা দরকার। দুটি পাতা বেরুলে মাটি খুঁড়ে দিতে হবে। ফলে গাছ শক্ত হবে আর ভাল গেঁড় (করম্) বের হবে।

গ্লাডিওলাস্ চাষে খুব একটা নাইট্রোজেন দিতে নেই। দিলে ডাঁটি খুব লম্বা আর নরম হয়ে দাঁড়ায়, ফলে সহজেই যায় ভেঙে। কুঁড়ি আর ফুলগুলি তাদের উজ্জ্বলতা হারায়। সার দেবেন ১০ গ্রাম নাইট্রোজেন, ৪০ গ্রাম ফসফোরাস এবং ৪০ গ্রাম পটাশ প্রতি বর্গ মিটারে। এই পরিমাণ সারে ফুলফল আর তাদের ডাঁটি (স্পাইক) খুব ভাল তৈরি হয়। খামার সারের সংগে ফসফোরাস এবং পটাশ মিশিয়ে দিতে হবে। সমস্ত নাইট্রোজেন সমান দু'ভাগ করে একভাগ দেবেন গেঁড় লাগাবার ১৫ দিন পরে আর বাকি অর্ধেক দেবেন ডাঁটি বেরুবার পরে।

॥ **রোগ-মড়ক** ॥ 'থারপস্' এবং 'কাট' নামের কীট গাছের বেশ ক্ষতি করে। 'থারপস্' দমন করাযাবে ০·০৫% নুভাকরণ্ (Nuvacorn), ছিটিয়ে দিয়ে 'কাট' কীটদের ধ্বংস করবেন একালাক্স (Ekalux 25 EC) ০·০৫% ছিটিয়ে।

ডাঁটিগুলি যাতে বাতাসে ভেঙে না যায় তার জন্য ডাঁটিগুলি দু'জায়গায় বেঁধে দিতে হবে। সব থেকে নিচের কুঁড়িটার নিচে একটা বাঁধন দিয়ে আরেকটা দেবেন নিচের থেকে ৪-৫টা কুঁড়ি-ফুলের ওপরে।

ধারেকাছের বাজারের জন্য ডাঁটি কাটবেন যখন প্রথম কুঁড়িটা মুখ খুলেছে আর অন্যগুলি সবে রং ধরতে আরম্ভ করেছে। ডাঁটি কাটতে হবে ৪টি পাতা

ছেড়ে দিয়ে যাতে গেঁড় ভাল তৈরি হয়। ডাঁটি কাটবার উপযুক্ত সময় হল সকালবেলা। কাটার পরই ডাঁটিগুলি জলে ডুবিয়ে রাখবেন।

ফুল সহ ডাঁটি কাটবার পরই মাঠে সেচ দিতে হবে বন্ধ করে। ফলে গেঁড় সুন্দর হয়ে উঠবে। পাতা শুকিয়ে গেলেই বুঝতে হবে গেঁড় তৈরি হয়েছে। বেশ যত্ন নিয়ে গেঁড় তুলতে হবে। গেঁড় তুলেই কাদামাটি সাফ করতে হবে। শুকিয়ে ০·২% বেনলেট্ জলে চোবাতে হবে—যাতে গেঁড় পচে না যায়। মাটি থেকে ছড়ানো রোগ ফুজিরিয়াম্ এর ফলে দমন হবে। এরপর থারপস্-দের আক্রমণ ঠেকাতে ৫% বি. এইচ. সি. দিয়ে ঘেঁটে নিতে হবে। ৪০ থেকে ৫০° ফাঃ তাপমাত্রায় খুব ভালভাবে গেঁড় রাখা যায়। সুবিধামত মাঝে মধ্যে দেখে নিতে হবে রোগ-মড়ক কিছু ধরেছে কিনা।

॥ গোলাপ (Rosa indica, Rosa multiflora) ॥

কবি বলেছেন, 'গোলাপকে যে নামেই ডাক না সে গন্ধ বিতরণ করবেই।' কবিও বিদেশি, ফুলও। না গোলাপ বোধ হয় এখন আর বিদেশি নয়। দেবতার পায়ে নির্দ্বিধায় গোলাপ আজ অর্ঘ্য দেওয়া হচ্ছে। সভ্যতার একটি অঙ্গ বোধ হয় গোলাপ। তাই ভারতে যে শহর যত উন্নত গোলাপও সেখানেই তত বেশি ব্যবহার করা হয়। গোলাপের কলম বিক্রি করে বেশ কিছু মানুষ (গৃহস্থ) উপরি আয় করেন কলকাতার আশপাশে।

॥ **প্রকার** ॥ বিদেশ থেকে প্রায় ২০,০০০ হাজারের মত বিভিন্ন প্রকারের (ভ্যারাইটি) কলম পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতে আমদানি করা হয়েছিল। এত বিভিন্ন রং-আকারের গোলাপের মধ্যে প্রায় দু হাজার প্রকারের নিত্য চাষ হচ্ছে। কোন্ জাতের কলমটা আপনার বাগানের পক্ষে উপযুক্ত সেটা বের করাই একটা সমস্যা। প্রত্যেক প্রকার কলমের জন্য চাই আলাদা জলবায়ু। উত্তর ভারত থেকে সবচেয়ে বেশী গোলাপের ফুল আসে নভেম্বরের শেষ থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত। উপকূলবর্তী এলাকা যেমন বোম্বে-মাদ্রাজ-এর মত জায়গা থেকে গোলাপের ফুল আসে বেশ কম সময়ের জন্য। কলকাতা আর তার আশপাশটায় গোলাপের ফুল উত্তর ভারতের মত অনেকটা সময় নিয়ে আসে না। আবার উত্তর ভারতে যে গোলাপের প্রকার ভাল কাজ দিচ্ছে সেটা ব্যাংগালোরে খুব একটা কাজে আসে না। উত্তর ভারতের গোলাপ "সুপার স্টার" বোধ হয় এর একটা ভাল উদাহরণ। অনেকের মতে সবচেয়ে ভাল গোলাপের প্রকার হল "হ্যাপিনেস্"। অন্যান্য প্রকারগুলি হল কুইন্

এলিজাবেথ, ক্রিশ্চিয়ান ডায়ওর, কিংস্ রেনসম্, সি-পিয়ারল্, মণ্টেজুমা, সুপার স্টার থরন্লেস্।

বিদেশে ব্যবসায়ে আসবার পক্ষে হ্যাপিনেস্-এর ১০০% থেকে ৪০০%বেশি সম্ভাবনা অন্য যে কোনো গোলাপের চেয়ে।

॥ জমিতে গোলাপ লাগাবার সময় দুটি ॥ বর্ষাকালের পরেই এবং শীতের মুখটায় অর্থাৎ নভেম্বরের গোড়ায় সাধারণত: গোলাপ লাগান হয়। নভেম্বরে লাগাবার সুবিধা হল,—এতে কলম-চারা মরে কম। আরও সুবিধা,—যত্নও করতে হয় কম। অনেকে বর্ষাকালে চারা লাগান। বর্ষাকালে চারা লাগাতে হলে—সেটা করতে হবে বর্ষার মুখে। এ সময়ে গোলাপের জমি হবে আশপাশের জমি থেকে উঁচু। গোলাপের গোড়া উঁচু হবে আর শক্ত করে বাঁধতে হবে। ফলে গোড়ায় জল পড়লে জল গড়িয়ে পড়ে যাবে। আপনি বর্ষা আর শীতে দুবার চারা লাগালে ফুল পাবেন দুবার—একবার পরের শীতকালে (যেটা নভেম্বরে লাগাবেন) এবং বর্ষারটা পাবেন শীত চলে যাবার মাস চারেক পরে। বর্ষায় লাগানো চারার বাঁচার হার কম হলেও তাড়াতাড়ি ফুল পাওয়া যায়—সেটা আপনার ব্যবসায়ে ফুল জোগানোর পক্ষে খুবই দরকার। বর্ষায় লাগানোর আর একটি সুবিধা,—ফুল ভুল হলে সেটা বদলে উপযুক্ত প্রকার ফুল লাগানো চলে।

॥ গোলাপ গাছ তৈরি করবেন কি ভাবে ॥ চাষের আছে নানা পদ্ধতি—কাটিং, গুঁটি কলম, দাবা কলম, জোড় কলম আর চোখ কলম। এদের মধ্যে চোখ কলম সবচেয়ে ভাল। চোখ কলম-এর কাজটাও সহজ আর গোলাপের ব্যবসায় নামতে হলে—চোখ-কলম অবশ্যই আপনাকে শিখতে হবে। চোখ কলম তৈরি করবেন সমতল বাংলায় জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে।

॥ গোলাপ গাছের যাবতীয় সার ॥ গোলাপ গাছের জন্য আপনি জমি তৈরি করবেন, সাত ভাগ মাটি, গুঁড়ো গোবর সার পাঁচ ভাগ, আধপোড়া গুঁড়ো মাটি তিনভাগ। এই মাটি গোলাপ গাছের গর্তে ফেলে দেবার পর আরও দেবেন দু'মুঠো করে হাড়ের গুঁড়ো আর সরষের খোল। এমন সরষের খোল ব্যবহার করবেন যা থেকে সম্পূর্ণভাবে তেল তুলে আনা হয়েছে। কারণ গাছ তার বীজ আর ফলে তেল দিলেও নিজে তেল পছন্দ করে না। নভেম্বর মাসে গাছ ছেঁটে দেবার সময় দিন তিনেকের ভেতর গাছের গোড়া খুলে দেবেন। তবে বছর খানেকের ছোট গাছের গোড়া খোলার দরকার নেই। গাছের গোড়া

থেকে তিরিশ-চল্লিশ সেমিঃ দূরে গাছকে গোল করে ঘিরে ১৫ সেমিঃ মাটি তুলে দিতে হবে। মাটি তোলার সময় সাবধান হতে হবে যাতে গাছের কোনো শিকড় কাটা না পড়ে। গাছের গোড়া খোলা অবস্থায় থাকবে দিন দশেক। গোড়া খোলার উদ্দেশ্য হল গোড়ায় হিম লাগানো। হঠাৎ বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখলেই মাটি দিয়ে গর্ত ভর্তি করতে হবে আর বৃষ্টির সম্ভাবনা চলে গেলেই মাটি ফের তুলে দেবেন। এবার গাছের গোড়ার তোলা মাটি গুঁড়ো করে তাতে মেশাবেন গাছের আয়তন বুঝে দু'ইঞ্চি বা ১৫ সেমিঃ ব্যাসের টবের দেড় থেকে তিন টব গুঁড়ো গোবর সার, ১০০-১৫০ গ্রাম স্টিমড্ হাড়ের গুঁড়ো, ৮ চামচ সুপার ফসফেট্, ৪ চামচ সালফেট অফ্ পটাশ, এবং এক চামচ সিকুয়েস্টিন প্লাস। এবার এই মাটি সার গোড়া খোলার দশ দিন পরে গর্তে দিয়ে গোড়া বুজিয়ে দিন। গোড়া খোলার সময়ে কোনো জল দেবেন না, অথবা গোড়া বন্ধ করেই জল দিতে যাবেন না। গাছে নতুন ডাল বেরুতে আরম্ভ করলে জল দেবেন। নতুন কুঁড়ি দেখা দিলে কিছু কাঁচা গোবর গাছের গোড়ায় দেবেন ছিটিয়ে। ভাল ফুল পেতে হলে তরল সারের জোগান চাই। তরল সার তৈরি করবেন গোবর আর তেল শূন্য সরষের খোল পচিয়ে।

সারাদিন রোদ পায় আর কাছাকাছি বড় গাছ নেই এমন জমি গোলাপ গাছের জন্য বেছে নিতে হবে। সবচেয়ে ভাল হয় এই জমি যদি নুড়ি বিছানো রাস্তার ওপর হয়। আরও দেখতে হবে,—বর্ষাকালেও যেন জমিটায় জল না জমে। হাইব্রিড্ বা উন্নত ধরনের গোলাপ চারা বসাবেন গর্ত করে আর গর্তের মাপ হবে,—দু'হাত গভীর আর ব্যাস হবে দেড় হাত। চারা লাগাবেন দেড় থেকে দু'হাত অন্তর। গর্তের মাটি হবে দো-আঁশ বা বেলে দো-আঁশ। গর্তের মাটি এ ধরনের না হলে আপনাকে বেলে-দো-আঁশ বা দো-আঁশ মাটি তৈরি করে নিতে হবে। মাটির প্রশম (PH) হবে ৬-৭½।

চোখ কলমের চারাগাছের জোড়ের অংশটি রাখবেন মাটি থেকে তিন সেমিঃ ওপরে আর জোড় কলম হলে জোড়ের মুখ থাকবে পাঁচ সেমিঃ মাটির ভেতরে। জোড় কলম লাগাতে জোড়ের মুখে যাতে কাদামাটি ঠিকমত পায় তার জন্য অনেকে ১২ ঘণ্টা জোড় কলমের শিকড় কাদা গোলা জলে চুবিয়ে রাখে। চারাগাছগুলি লাগিয়ে তাদের শিকড় এমনভাবে বাঁধতে হবে যাতে কোন-ক্রমেই শিকড় নড়ে-চড়ে না যায়। এধরনের চারাগাছগুলির জন্য সাত দিন ধরে ছায়ার ব্যবস্থা করলে ভাল হয়। গাছে আর্দ্রভাব বজায় রাখতে

চারাকে পলিথিন ব্যাগে ঢেকে রাখবেন। কারণ গাছ তার আয়তনের কয়েক গুণ বাষ্পমোচন করে। চারাগাছ লাগাবেন বিকেল বেলায়। চারা লাগাবার সময় গর্তে চারা দিয়ে ভাল করে লক্ষ্য করবেন চারার শিকড়গুলি যেন ভাল-ভাবে ছড়িয়ে থাকে। তারপরেই ওপর থেকে আস্তে আস্তে মাটি ফেলতে হবে। উইয়ের হাত থেকে চারাকে বাঁচাতে গর্তে ৩ গ্রাম হারে ডি. ডি. টি. প্রতি গর্তে দিতে হবে। জমিতে উইয়ের আক্রমণ ঠেকাতে দু-মাস অন্তর অন্তর এটা দিতে হবে। ডি. ডি. টির বিকল্প হলো এলড্রিন বা হেপ্টাক্লোর। চারা লাগাবার ৩-৪ মাস পরে গাছে কুঁড়ি এলে সেটা ভেঙে দিতে হবে। কারণ অত অল্প সময়ে কুঁড়ি এলে গাছের স্বাস্থ্য ভাল থাকবে না। বছর ২-৩ অন্তর গোলাপ বাগানে চুন দেবেন। জোড়-কলমের চারাগাছের নিচে বুনো গোপাপ গাছটির অর্থাৎ স্টক্-এ ডাল বেরতে আরম্ভ করলে সেটা ভেঙ্গে দিতে হবে। কারণটা নিশ্চয়ই বুঝতে পেয়েছেন? হ্যাঁ বুনোগাছের বড়ো বাড়। গাছের গোড়া সবসময় পরিষ্কার রাখবেন এবং দুবার জল দেবার ফাঁকে একবার মাটি খুঁচিয়ে দেবেন। শীতকালে এ-ব্যাপারে মোটেই অযত্ন করবেন না।

সমতল বাংলায় গোলাপকে দু-বার ভাল ফুল দিতে দেখা যায়। ছাঁটার সময় প্রথম দফার ফুল এবং পুরানো ফুল ঠিকমত সরিয়ে ফেললে ভালো ফুল দেবে পরের দফায়। প্রথম দফায় ফুল ফুটে যাবার পর দ্বিতীয় দফায় ভাল ফুলের জন্য আপনাকে নিয়মিত তরল সার যুগিয়ে যেতে হবে। ফুল তুলবেন সাত সেমিঃ মত ডাঁটি সহ। কারণটা হল ফুলটার ঠিক নিচের কচি ডাল থেকে ভাল ফুল পাওয়া সম্ভব নয়। গাছে মরা ডাল দেখলেই কেটে ফেলবেন।

ফুল পাঠাবেন পিচবোর্ডের চৌকো বাক্সে। আলগাভাবে ফুল ভরবেন। দূরের জায়গায় ফুল পৌছাবার পর বাক্সের মুখ সম্পূর্ণ খুলে দেবেন। ফুল তখন গরম জল ছিটোলেই রং ধরতে পারে। তাই বেশ কিছুক্ষণ হাওয়ায় ঠাণ্ডা করে অল্প জল ছিটোবেন ফুলের স্বাভাবিক সজীবতা ফিরিয়ে আনতে।

বিঃ দ্রঃ ব্যবসায়ে ফুল বলে টবের চাষটা আলাদা ভাবে বল্লাম না। তবে সম্পূর্ণ গোলাপ চাষটা পড়লে নিজের চেষ্টায় টবেও উন্নত পর্যায়ের ফুল ফোটাতে পারবেন।

॥ ডালিয়া ॥

বছর কয়েক আগে ব্যবসায়ে ডালিয়া লিখলে পাঠক হয়ত চমকে উঠতেন। ডালিয়া বিদেশি ফুল। শখের বাগানে এসেছিল একসময়, এখন তার ব্যবসা?

না ডালিয়ার এখন আর সে অবস্থা নেই। আমাদের দেশে ডালিয়া নিয়ে প্রচুর পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে। বের করা হয়েছে প্রচুর প্রকার। যে প্রকার-গুলি অনায়াসে বিদেশি প্রকারগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় আসতে পারে। বিদেশে ডালিয়া ব্যবসায়ের উপকরণ হিসেবে অনায়াসে পাঠানো চলে। পরিবহণের ঝামেলা সহ্য করবার প্রচুর শক্তি রয়েছে ডালিয়ার। শক্ত ফুল। বেশ কিছুদিন তরতাজা থাকে। বিদেশে পাঠাবার সুযোগ না থাকলে পুষ্প-সজ্জা, গৃহসজ্জা এবং বিয়ের নানা উপকরণে ফুলটা ব্যবহার করা চলে। খড়দহের (উত্তর চব্বিশ পরগণা) এ. কে. দেওয়ান ডালিয়ার চারা বিক্রি করে প্রচুর রোজগার করেন।

॥ ডালিয়া চাষে অসুবিধা ॥ ডালিয়া চাষে সবচেয়ে বেশি অসুবিধা সামনের বছরের জন্য গাছ বাঁচিয়ে রাখা। এত অসুবিধা সত্ত্বেও সমতল বাংলায় সবচেয়ে বেশি ডালিয়ার চাষ হয়। গত বছরের বেঁচে থাকা ডালিয়া গাছে নির্দিষ্ট সময়ের আগে কচিগাছে কুঁড়ি এসে সহজেই সমস্ত পরিকল্পনা বানচাল করে দেয়। ডালিয়া চাষে সার্থকতা আনতে গেলে,—লেট্ কাটিং করে আগামী বছরের জন্য ডালিয়া বাঁচিয়ে রাখা, ডালিয়ার উন্নত সংকর প্রজাতি তৈরির উপযোগী-পদ্ধতি, কাটিং কাটার ভাল নিয়ম, ডালিয়ার রোগ-মড়ক ভালভাবে লক্ষ্য করা আর তার প্রতিষেধক বের করা জানা দরকার। লেট্ কাটিং করে গাছ বাঁচিয়ে রেখে তাদের থেকে আগামী বছরের ডালিয়ার উন্নত কচিগাছ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া সম্ভব। ফলে ডালিয়া চাষের সমস্যা অনেকটা দূর হবে। বড় বাজারে ফুলের বাজারে ডালিয়া বিক্রি হয় ১০০টি ২৫ টাকায়। গাড়ি আর তোড়াতে ডালিয়ার ব্যবহার প্রচুর।

॥ ডালিয়ার প্রকার ॥ ফুলটির মূল তিনটি প্রকার,—ডেকরেটিভ্, ক্যাকটাস্ এবং পম্পন। পাঁপড়ির গড়ন বা আকৃতি অনুযায়ী ডেকরেটিভ্ ডালিয়াকে ভাগ করা হয়েছে—ফর্ম্যাল ডেকরেটিভ্ ও ইনফর্ম্যাল ডেকরেটিভ্। ক্যাকটাস্ ডালিয়াকে ভাগ করা হয়েছে ইনকাভর্ড ক্যাকটাস্ এবং ষ্ট্রেট ক্যাকটাস্। জায়াণ্ট ডেকরেটিভ দশ ইঞ্চি বা তারও বেশি চওড়া হতে পারে ফুলের ব্যাসে। ক্রয়ডন মনার্ক জায়াণ্ট ফর্ম্যাল ডেকরেটিভ্ ও ক্রয়ডন মাষ্টার-পীস্ জায়াণ্ট ইন্‌ফর্ম্যাল ডেকরেটিভ্ ডালিয়ার উদাহরণ। 'আর্থার হাম্বলি' লার্জ ডেকরেটিভ ডালিয়ার অন্য উদাহরণ। ফুলটার ব্যাস হবে আট থেকে দশ-ইঞ্চি,। 'ভিক্ষুস্ মাদার' মিডিয়াম্ ডেকরেটিভ্ ডালিয়া। ৬-৮ ইঞ্চি এর ব্যাস। স্বামী লোকেশ্বরানন্দ স্মল ডেকরেটিভ্ ডালিয়া (৪")।

ক্যাক্‌টাস্‌কে ভাগ করা হয়েছে—ক্যাক্‌টাস্‌ ও সেমি ক্যাক্‌টাস্‌। 'আর্ট-লিঙ্ক লেটার' সেমি ক্যাক্‌টাস্‌। ড্রেকেনবার্গ লার্জ ইনকার্ভড ক্যাক্‌টাস্‌। জুয়ানীতা মিডিয়াম্‌ ষ্ট্রেট ক্যাক্‌টাস। 'চিয়ারিও' স্মল সেমি ক্যাক্‌টাস্‌ ডালিয়ার উদাহরণ।

পম্পন ডালিয়ার ব্যাস সবসময় ২ ইঞ্চি ব্যাসের হতে হবে। ফুলের গড়ন হবে গোল আর পাঁপড়ির গড়ন মৌচাকের খোপের মত। ভাল কয়েকটি ডালিয়া হল,—কোলারেট ডালিয়া, ডাবল শো-অ্যাণ্ড ফ্যানসি ডালিয়া, ডোয়ার্ফ বেডিং ডালিয়া, এনিমোন ফ্লাওয়ারড ডালিয়া। ফুলগুলির আগার দিকটা লম্বা ভাবে সুন্দর করে কাটা। 'লেস্‌ মেকার' আর 'টেরি' আরও দুটি ভাল ডালিয়া।

সার মাটি প্রভৃতি॥ জমিতে ডালিয়া ফুলের কেয়ারি করবেন এমন জায়গায় যেখানে সারাদিন রোদ পড়ে বা অনেক সময় ধরে রোদ আসে। কাছাকাছি কোন বড় গাছ না থাকাই ভাল। কেয়ারি হাত দুয়েক চওড়া করে তৈরি করতে হবে যাতে দুসারি গাছ পাশাপাশি লাগান যায়। অনেক কেয়ারি করতে চাইলে প্রতি দু-সারি কেয়ারির পাশে মাঝাখানে পরিচর্যা ও চলাফেরার জন্য দেড় হাত জায়গা রাখবেন। মাটি কোপাতে হবে, ৪৫ সেমিঃ মত গভীর করে। কুপিয়ে মাটি গুঁড়ো যেমন করবেন, ঠিক সেই সঙ্গে গাছের শেকড়-টেকড় দেবেন ফেলে। সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবরের মাঝামাঝি পর্যন্ত যদি ডালিয়ার কচি গাছ লাগান তবে সমস্ত জমিটা হবে আশপাশের জমির থেকে উঁচুতে। আর এরপরে অর্থাৎ নভেম্বর নাগাদ কচি গাছ লাগালে জমি হবে আশপাশের জমি থেকে একটু নিচুতে।

কেয়ারির মাটিতে দশ সেমিঃ পুরু করে গোবর সার বিছিয়ে তা ভাল করে কেয়ারির গুঁড়ো করা মাটির সঙ্গে দিতে হবে মিশিয়ে। এর পরে কেয়ারির (দেড় হাত চওড়া × ২ হাত লম্বা) মাটিতে ১৫০ গ্রাম হাড়ের গুঁড়ো, ৭৫ গ্রাম সুপার ফসফেট, এবং ৩০ গ্রাম সালফেট অব্‌ পটাশ মেশাতে হবে। ঐ দেড় হাত চওড়া × দু হাত লম্বা কেয়ারির জন্য চুন লাগবে ১২০ গ্রাম। কচি গাছ লাগানোর ১৫ দিন পরে ডাই-এমোনিয়াম ফসফেট এবং ১৫ দিন পরে আবার ঐ ডাই-এমোনিয়াম্‌ ফসফেট দেবেন দশ গ্রাম মত। গাছে কুঁড়ি এলে মিশ্র সার দেবেন। মিশ্র সার তৈরি হবে,—২ ভাগ এমোনিয়াম্‌ সালফেট্‌, ২ ভাগ সুপার ফস্‌ফেট এবং ১ ভাগ সালফেট্‌ অফ্‌ পটাশ দিয়ে। সার দেবেন গাছকে কেন্দ্র করে বিঘত খানেক দূরে গোল ছোট নালা কেটে। নালার

গভীরতা হবে পাঁচ সেমিঃ, চওড়া খুবই কম। সার ঐ নালায় দিয়ে মাটি চাপা দিতে হবে। কুঁড়ি কিছুটা বড় হবার পর সপ্তাহে একবার কি দুবার তরল সার (সমান পরিমাণে গোবর এবং খোল পচান) দেওয়া ভালো। ডালিয়া সাধারণত মাটির প্রশম (PH) ৪-৮ হলে চলে তবে ভাল ডালিয়া পাবেন যে মাটির প্রশম ছয় থেকে সাড়ে ছয়।

নভেম্বরের গোড়ায় ডালিয়া ফুল॥ একটু যত্ন আর চেষ্টা চরিত্র করলে নভেম্বরের গোড়ায় ডালিয়া পাওয়া যায়। নভেম্বরে ফুল চাইলে ডালিয়ার কচি গাছ লাগাতে হবে সেপ্টেম্বরের প্রথমে। আবার লেট কাটিং করে বাঁচিয়ে রাখা গাছ সেপ্টেম্বরে কচি গাছ বসাতে খুব কাজে আসবে। আপনি নভেম্বরে ফুল ফোটাতে আরম্ভ করলে পুরো চারমাস ফুলের ব্যবসায়ে অবশ্যই সাফল্য লাভ করবেন যদি আপনার বাজার থাকে। সাধারণ নিয়মে ডালিয়া ফোটান হয় মাত্র দু মাস।

এ ছাড়া কাটিং করা কচি ডালও (অনেকে একে চারাও বলে) আপনি একই মরশুমে বেচতে পারবেন। কারণ এই কচি ডালের কাটিং সমান ভাল ফুল দিয়ে যাবে পরিপূর্ণ গাছের মত।

ভাল ফুলের জন্য ছোট গাছের কুঁড়ি ভেঙে দেওয়া॥ মাঝারি-ছোট-ক্ষুদে প্রভৃতি পম্পন ডালিয়ার চাষ করা হয় এক সঙ্গে অনেক ফুল পাবার জন্য। ভাল ফুল পাবার জন্য সাধারণত ফুল গাছগুলির কেবল মাঝের বড় কুঁড়িটি রেখে আর সব কুঁড়ি ভেঙ্গে দেওয়া হয়। পম্পন ফুলের বেলায় কুঁড়ি ভাঙ্গার কোন দরকার পড়ে না। বেশি ফুল ফোটানো হবে এমন গাছের বেলায় ফুল ফোটার মাঝে সময় দেওয়া দরকার।

জায়েন্ট ও বড় (লার্জ) ডালিয়ার বেলায় কুঁড়ি ভাঙবেন॥ জমি থেকে গাছ যখনই পঁচিশ সেমিঃ বড় হবে তখন সেই গাছটির মাথা নখ দিয়ে খুঁটে দেবেন। এরপর গাছ ডাল ছাড়তে আরম্ভ করলে মাত্র চারটি ভালো ডাল রেখে অন্য ডালগুলি ভেংগে দেবেন কচি অবস্থায়। এই চারটি ডালে যখন কুঁড়ি আসবে তখন বড় কুঁড়িটি রেখে এবং সেই ডালের নিচের দিকে একটি সতেজ কচি ডাল রেখে অন্য সব ডাল আর কুঁড়ি ভেঙে ফেলতে হবে। ফলে চারটি ডালে মাত্র চারটি বড় ফুল হবে এবং এদের তুলে নেবার পর এই চারটি ডালের নিচের থেকে গজালি আর চারটি ডালে সময়কালে আর চারটি-ই ফুল হবে। ফলে আপনি একটি ডালিয়া গাছ থেকে মরশুমে আটটি ডালিয়া পাচ্ছেন।

আলামন্দ
কেনা
কসমস
জিনিয়া
পিটুনিয়া

ড্যাফোডিল

টিউলিপ

বোগনভিলিয়া

ডালিয়া

গাঁদাফুল

প্রথম দফায় ফুল ফুটে যাবার পর গাছে আর চারটি ফুলের জন্য আবার কিছু সার দিতে হবে।

ডালিয়ার কাটিং কচি গাছ প্রভৃতি॥ সেপ্টেম্বর থেকে ডালিয়ার কচি গাছ বসাতে চাইলে আপনাকে কাটিং আরম্ভ করতে হবে আগষ্টের মাঝামাঝি থেকে। এবং একই মরশুমে ফুল পেতে হলে নভেম্বর পর্যন্ত কাটিং বসান চলবে। কাটিং করবেন খুব সকাল বেলা অথবা গোধূলি বেলায়। কাটিং হিসেবে ব্যবহার করবেন ১০ সেমিঃ মত লম্বা কচি ডালকে এবং কাটিং করেই সেটা কাটিং বসাবার মাটিতে বসিয়ে দিতে হবে। কাটিং কাটা হবে গাঁটের দশ মিলিমিটার ওপরে। গাঁট থেকে ডাল ছাড়লে সেই ডালও কাটিং হিসেবে ব্যবহার চলবে। কাটিং কেটে তাতে সেরাডিক্স বি-ওয়ান্ লাগিয়ে নেবেন।

কাটিং লাগাবার ১৫ দিন পরে পাখির নখের মত ৩-৪টি শিকড় এলে সেই কাটিংও ধীরে ধীরে উঠিয়ে সাত সেমিঃ ব্যাসের টবে প্রথমে লাগাতে হবে। এর পরই ধীরে ধীরে বেশি রোদ খাইয়ে জমিতে লাগাবার উপযুক্ত করতে হবে। দিন সাতেক সময় লাগবে এ-সব কাজে। ডালিয়া গাছের ছোট টবে বা খুরিতে এই অবস্থায় থাকাকে কচি গাছ বলে। কলকাতা এবং পশ্চিম বাংলায় অনেক শহরের ভদ্র ফুল চাষি মানুষ ডালিয়ার কচি গাছ বিক্রি করে বেশ পয়সা কামান।

সামনের মরশুমের জন্য ডালিয়া কি ভাবে রাখবেন॥ সামনের বছরের জন্য রাখতে পারেন, (১) লেট কাটিং (২) গোড়ায় বাল্ব বা কন্দজ মূল হয়েছে এমন গাছ বাঁচিয়ে রাখা, (৩) শুধু বাল্ব বা কন্দজ মূল তুলে রাখা। এর মধ্যে লেট কাটিং করে বাঁচিয়ে রাখাই অনেকের মতে সবচেয়ে ভাল। বাল্ব করে রাখলে অসময়ে বিশেষ করে ভিজে আবহাওয়া পেলেই পাতা বেরিয়ে যায়। তবে বাস্তবতাকে সুখ্যাতি করা হবে যদি তিনটি নিয়মই এক সঙ্গে মানা হয়। লেট কাটিং হল ডিসেম্বর মাস থেকেই ডালিয়ার কাটিং করে তা বাঁচিয়ে রাখা। কাজটা ডিসেম্বরের শেষের দিকে আরম্ভ করাই ভাল। জমির ডালিয়া ফুল দেওয়া শেষ করলে গাছ জমি সহ তুলে টবের মাটিতে বসিয়ে রাখতে হবে। নিয়ম করে গাছে জল দিতে হবে যত দিন গাছ বেঁচে থাকে। মরে গেলে জল দেওয়া বন্ধ করতে হবে।

মরশুমের মুখটায় ডালিয়া গাছের কাটিং পেতে গাছের পরিচর্যা॥ গত বছরের টবে রাখা ডালিয়া গাছ বা বাল্ব থেকে বেরন গাছ

মাঝখান থেকে কেটে ফেলতে হবে। এরপর গাছ যে নতুন ডাল ছাড়বে সেই থেকে তৈরি হবে নতুন বছরের কাটিং।

জমির ডালিয়াতে জল দেবেন ভাসিয়ে। এরপর আবার জল দেবেন সাতদিন পরে। ডালিয়া যখন ফুল দেবে তখন তার মাটি থাকবে ভেজা। পোকা মাকড় আক্রমণ করলে ফলিডল এবং পাউডারি মিলডিউ রোগে মোরেষ্টান দেবেন।

॥ জবা (হিবিস্‌কাস্) ॥

ধৈর্যশীল পাঠক এতক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন বিশেষ করে ব্যবসায়ে ফল পড়ে, আমি এমন সব ফল ফুলের কথা বলছি যা আবহমানকাল থেকে পশ্চিম-বাংলায় চাষ হচ্ছে, অথবা একেবারে নতুন কিন্তু ব্যবসায়ে প্রচুর সম্ভাবনা আছে, যেমন পীচ ফল। জবার ব্যবহার আবার ফের কি শুনব ? ভাবছেন হয়ত, ও তো স্রেফ পূজাতে, বিশেষ করে কালী পূজায় লাগে। না সবটা বলা হলো না। ঘর, ফুলদানি, লন আর বাগান সাজাতে জবার ব্যবহার আজকাল বেশ বেড়ে গেছে। শিক্ষিত বেকার ভাইয়েরা যাঁরা এঁচে রেখেছেন স্রেফ বাড়ি বাড়ি ফুলের প্যাকেট পৌঁছে দিয়ে কিছু রুজি রোজগারের ধান্দা করব, তাঁদের অনুরোধ ফুলের প্যাকেটে অবশ্যই একটা করে জবা রাখবেন। সব পূজায় জবা দেওয়া চলে।

জবার প্রকার ভেদ ॥ জবার বা হিবিস্‌কাসের চারটি মূল ভাগ আছে, (১) যে জবা আমরা সবাই দেখি সেটা হল রোজা সাইনেন্‌সিস্। (২) সিরিয়া-কাস্ ভাগের জবা পাহাড়ি অঞ্চলে একদল বা একসারি পাঁপড়ি এবং দু সারি পাঁপড়িওলা ফুল দেয়। (৩) জবা সিজোপেটালাস্ আমাদের দেশে ঝুমকো জবা নামে পরিচিত। (৪) অনেকেই হয়ত জানেন না স্থলপদ্ম জবারই অন্তর্গত। বৈজ্ঞানিক নাম হল জবা মিউটাবিলিস্।

হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে হাওয়াই হোয়াইট্ জবা জবার ব্যাপারে যুগান্তর এনেছে। সাদা এই ফুলগুলির ব্যাস এক ফুটেরও বড়। ফুলটির প্রচুর প্রকার আছে ঐ দ্বীপপুঞ্জে। বাঙ্গালোরে গাছটি অর্থাৎ হাওয়াই হোয়াইট্ এনে এদেশের জবার সঙ্গে মিলন ঘটিয়ে সংকর জবার সৃষ্টি করা হয়েছে। সংকর জবা সৃষ্টিতে রোজা সাইনেন্‌সিস্-এর সাহায্য নেওয়া হয়েছে। অনেকের মতে সংকর জবা গাছ-গুলি হাওয়াই হোয়াইট্ থেকে বেশি কষ্টসহিষ্ণু।

সমতল বাংলাতে সংকর প্রজাতি সৃষ্টির কাজ চলছে। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে আমরাও ভাল জবার প্রকার সৃষ্টি করতে পারব।

চাষ-পরিচর্যা প্রভৃতি ॥ সারাদিন রোদ পায় এবং বর্ষায় জল জমেনা এমন জায়গায় জবার চাষ করা উচিৎ। গাছ লাগাবার গর্ত হবে হাত দেড়েক গভীর আর মুখটা হবে হাত দেড়েক চওড়া। যে-কোন মাটি বিশেষ করে দো-আঁশ মাটি হলে ভাল হয়। গর্তের সারমাটি তৈরি করবেন,—সাধারণ মাটি পাঁচ ভাগ, খামার সার বা পুরান গোবর সার দুভাগ, পাতা পচা সার বা গ্রিন্ কম্পোষ্ট দুভাগ এবং হাড়ের গুঁড়ো একভাগ। গোবর সার এবং পাতা পচা সার ভাল করে গুঁড়ো করে ছেঁকে নেবেন। যতদিন না গাছ ধরছে একদিন অন্তর আর গাছ ধরে গেলে সপ্তাহে একদিন গোড়া ভাসিয়ে জল দেবেন। গাছের গোড়া যাতে ভাল করে জল পায় তার জন্য গাছের গোড়ায় থালার মত গোল করে বেঁধে দিয়ে তার উপর কচি ঘাস বসিয়ে দিতে হবে। এটা গরমকালের জন্য। বর্ষা এলে থালা ভেঙে গাছের গোড়া ঢাল ভাবে বেঁধে দেবেন—ফলে গাছের গোড়ায় জল দাঁড়াতে পারবে না। শীতকালে গাছে দশদিন অন্তর একবার জল দিলেই চলবে। বর্ষাকাল বাদ দিয়ে গাছের গোড়া নিয়মমতো খুঁচিয়ে দেবেন এবং গাছের গোড়ার ঘাস হতে দেবেন না। জবা গাছ বছরের যে-কোনো সময় লাগালে চলে তবে শীতকালে লাগালে খাটনি কম।

গ্রীষ্ম আর বর্ষাকালে জবা ভালো আর বেশি সংখ্যায় ফুল দেয়। গাছে এসময় একটু বাড়তি সার দেওয়া দরকার। ফেব্রুয়ারি মাসের শেষে প্রতি গাছের গোড়ার মাটিতে দুঝুড়ি গোবর সার গোড়ার একহাত দূরে গোল করে মাটি কেটে দিতে হবে। মার্চ মাসে দেবেন গাছের গোড়া থেকে চল্লিশ সেমিঃ দূরে গোল করে নালি কেটে। ২০০ গ্রাম ষ্টেরামিল দিয়ে মাটি ভর্তি করে দেবেন নালায়। দেড়মাস পরে এভাবেই আবার ষ্টেরামিল দেবেন। গাছে যে সারই দিন তার পরেই তিনদিন পরপর জল দেবেন। শীতকালে জবা বিশ্রাম নেয়, তাই এসময় কোনো সার দেবার দরকার নেই। নতুন বসান গাছ জোরাল না হওয়া পর্যন্ত কোনো সার দেবার দরকার নেই।

জবা গাছের বংশ বিস্তার ॥ কাটিং-গুটিকলম-দাবাকলম-চোখকলম এই চার ভাবেই জবার বংশ বৃদ্ধি সম্ভব। তবে দাবাকলম আর গুটিকলম গাছ বিস্তারের কাজে বেশি ব্যবহার করা হয়। নরম সংকর জাতের গাছের বেলায় চোখকলমে ভাল ফল পাওয়া যায়।

জবা গাছের পরিচর্যা-যত্ন ॥ জবা গাছ ছাঁটলে খুব ভাল ফুল পাওয়া যায় সত্যি কিন্তু অনেক সময় ডাল ছাঁটলে নতুন ডাল বেরতেই চায় না। তবে মরা, রোগ লাগা ডাল, বা যেসব সংকর জবা গাছে ডাল ছাঁটলে ভাল ফুল পাওয়া যায়, সেসব গাছ অবশ্যিই ছাঁটতে হবে। গাছ ছাঁটার পরে ১৫০-২০০ গ্রাম বোনমিল বা হাড়ের গুঁড়ো দিলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

॥ জবা গাছের রোগ-মড়ক ॥

রেড্ স্পাইডার, ফাংগাস্ রোগ মিলডিউ, বীটেল প্রভৃতি রোগ জবা গাছে প্রায়ই দেখা যায়। ওষুধপত্তর,—কীটনাশক ফলিডল, ফাংগাস্ রোগের জন্য থিওভিট্, প্রভৃতি গাছে ব্যবহার করে যদি ভালো ফল না পাওয়া যায় তবে সেই গাছ কেটে পুড়িয়ে ফেলে দেবেন।

॥ বেলি, জুঁই প্রভৃতি (জেসমিনাম্ সামবাক্) ॥

বেল, জুঁই প্রভৃতি সুগন্ধি ফুলের মালা, গোড়ে, মেয়েদের কবরীবন্ধন, গয়নার কথা কে না জানে, অথচ ফুল বা ফুলগুলির ব্যাপক চাষ পশ্চিমবাংলায় বৈজ্ঞানিক পন্থায় মোটেই হয় না। চৈত্র দিনে ঝরাপাতার পথে যাদের আবির্ভাব, চেষ্টা চরিত্র করলে তাদের ফলন অনায়াসে বর্ষার শেষ পর্যন্ত টেনে নিয়ে চলা যায়। খরচাও কম। ফুল ধরার আগটায় কিছু যত্ন আর ফুলের কিছু সময়ের ছাড়া আর কোনো যত্নেরই দরকার নেই।

জুঁই বা জেসমিনাম প্রজাতিগুলির খুব ভাল শ্রেণীবিভাগ হয়নি তাই অনেক সময় একই গাছকে বিভিন্ন নামে ডাকতে দেখা যায়। জুঁই, বেল এবং এই গণের সব ফুলগুলির চমৎকার গন্ধ রয়েছে এবং এই গন্ধের জন্য শুধু মালা-গয়না নয় সুগন্ধি তেল, এসেন্স আতর প্রভৃতি তৈরি হয় এদের দিয়ে। যদিও জুঁইয়ের আওতায় অনেক ফুলই আসছে তবুও নাম করতে হলে বলতে হবে, শীতকালের পিংক কুন্দ, গ্রীষ্ম ও বর্ষার ডাবল বা দুই সারি পাঁপড়ির জুঁই এবং বেলির বিভিন্ন প্রকার, যেমন সুলতানি, রাইরাই জাপানিজ এবং অন্যান্য। গরমের প্রথমেই ফোটে নবমল্লিকা। সব বেল-জুঁই গাছই ফুল ফোটার পর ছেঁটে দিতে হয়। বংশ বিস্তার হয় এদের দাবাকলম আর কাটিং-এর সাহায্যে। জুঁইয়ের কিছু প্রজাতির জন্মস্থান ভারত। জুঁই হিউমিল স্বর্ণ চামেলি নামে প্রসিদ্ধ। দেশি গাছ। সোনালি হলদে রংয়ের ফুল ফোটে বর্ষাকালে।

চাষ-যত্ন প্রভৃতি ॥ জমি তৈরি করবেন তিন-চারটি লাঙল দিয়ে।

বিদে দিয়ে আগাছা মেরে মই লাগিয়ে জমি সমান করুন। গোবর সার দেবেন বিঘেতে আট-দশ গাড়ি। চলনসই মত সেচে মাটি ভিজলেই চারা বসান চলবে জমির 'জো' বুঝে।

গাছের ফুল শেষ হবার পরই গাছ ছেঁটে দেবেন। পরের বছর কচি নতুন ডালে আবার নতুন করে ফুল আসবে। গাছের ফলন কমে গেলে সমস্ত গাছ ঝেড়ে ফেলে নতুন করে চাষ করতে হবে।

প্লাস্টিকের ব্যাগে ফুল দূর জায়গায় চালান দেওয়া যায় ভাল ভাবে। নির্দিষ্ট জায়গায় পৌছাবার পর ব্যাগের মুখ খুলে ফুল ঠাণ্ডা হতে দেবেন। বাইরের এবং ফুলের তাপমাত্রা এক হলে,—তবেই জল ছিটিয়ে দিতে পারেন।

॥ মোরগ ঝুঁটি ফুল (কক্‌স্ কম্ব) ॥

মোরগের ঝুঁটির মতো ভেলভেটের মত নরম লালচে রংয়ের মোটা-লম্বা-ফুলগুলি সহজেই গ্রাম বাংলায় চোখে পড়ে। 'ঠেলার নাম বাবাজি' না হলে চট করে কেউ এ ফুলটার চাষ করে না। এখনই পাঠক অর্থাৎ উৎসাহী ফুল চাষিভাই প্রশ্ন করবেন তবে এই ফুলটার চাষ কেন? হংস-দলে বক কেন? মোরগ-ঝুঁটির অবদান অনেক। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে। যেখানেই গোলাপ আছে সেখানেই মোরগ ঝুঁটির অবদান গোলাপের বিকল্প হিসেবে। ব্যাপারটা আমিও জানতাম না। জানলাম ফুলিয়ার ভেতরে কৃষিপল্লীর এক ফুলচাষী ও ফুলের গয়না শিল্পীর ফুলের গয়না দেখতে গিয়ে। দেখলাম চাষিভাইটি বেবাক গোলাপের জায়গায় মোরগ ঝুঁটি বসিয়েছেন। কারণটা জিজ্ঞাস করতে বললেন, কলকাতায় একটা মোটর গাড়ি ফুলে সাজাতে যদি ৫০০ টাকা পাওয়া যায়, গ্রামে পাওয়া যায় ১০০ টাকা। অথচ গোলাপ ফুলের দাম কলকাতা থেকে গ্রামে বেশি। তাই গোলাপের বিকল্প হিসেবে মোরগ ঝুঁটির এত কদর।

মোরগ ঝুঁটি ফুলের ব্যবহার ॥ ফুলের তোড়ায়, ফুলের মুকুটে, গাড়ি-খাট-পালংক-চেয়ার ঘর সাজাতে এবং ফুলশয্যায় নববধূর গয়নায়।

চাষ ॥ বেলে দো-আঁশ অথবা শুধু দো-আঁশ মাটিতে চাষ ভাল হয়। বীজ থেকে চারা বের করে জ্যৈষ্ঠের শেষে বা আষাঢ়ের প্রথমে লাগাতে হয়। সারের খুব একটা বায়নাক্কা নেই। গোবর সার বিঘেতে আট গরুর গাড়ি দিলেই চলে। বিকল্পে পরিমাণমত মিশ্র রাসায়নিক সার।

ফুল পাওয়া যায় অগ্রহায়ণের প্রথম দিকে। গাছ মরে গেলে মরা গাছের ডাল থেকে আবার গাছ তৈরি করা যায়। একটি গাছ থেকে ২ কেজির মত ফুল হয়। দাম ৪ টাকা।

গাঁদা (টেগেটিস্) ॥

সমতল বাংলায় গাঁদা ফুলের নতুন করে পরিচয় দেবার কিছুই নেই। কারণ অযত্নেও এই ফুলগুলি শীতকালে ফোটে। আজকাল পয়সাও পাওয়া যায় প্রচুর। নদীয়া জেলার কৃষিপল্লীর (ফুলিয়ার মধ্যে) শ্রীমতিলাল হালদার বলছিলেন তাঁর এক শ্যালক, কালীনারায়ণপুরে বাড়ি, রক্ত জবা বিক্রি করে গত বছর প্রচুর টাকা করেছেন। শ্রীহালদার আফশোষ করেছিলেন কেন তিনি ব্যাপকভাবে গাঁদার চাষ করলেন না। এ বছর গাঁদার বাজার ভাল। বড়বাজারে ফুলের দোকানগুলিতে কম করে চার টাকা কেজি। শ্রীহালদারের শ্যালক গত বছর মাত্র দশ কাঠা জমিতে গাঁদা চাষ করে পেয়েছেন প্রায় দশ-ক্যুইণ্ট্যাল ফুল। এই ফলন আরও বেড়ে যাবে উন্নত ধরনের প্রকার গুলির চাষ করলে। এই বইতে যে তালিকা দেওয়া আছে সেই তালিকা থেকে আপনি উন্নত ধরনের কলম প্রভৃতি কিনতে পারেন।

চাষ ॥ বীজ কাটিং লাগাবেন শ্রাবণের দিকে। দুর্গা পূজার পর চাষ লাগালে আপনি চৈত্র মাস পর্যন্ত ফুল পাবেন। মাটি এঁটেল দো-আঁশ হলে ভাল হবে। উপযুক্ত লাঙ্গল দেবার পর—গোবর বা খামারের আবর্জনা সার দেবেন বিঘে প্রতি পাঁচ গরুর গাড়ি। সুফলা সারের চাপান দেবেন সেচ বা জল দেবার পর। মাঝে মাঝে নিড়ানি, আর শুকনো অসুস্থ ডালপালা থাকলে কেটে ফেলবেন। শীতের প্রথম দিকটায় ফুল তুলে হালকা সেচ দিয়ে কিছু সুফলা ছড়িয়ে দেবেন জমিতে।

গাঁদার প্রকার ॥ গাঁদা ফুল নানা আকারের হয়—দেড় সেমিঃ থেকে ১৪ সেমিঃ বা ৬ ইঞ্চি। গাছের উচ্চতা ১৫ সেমিঃ থেকে ৯০ সেমিঃ। আফ্রিকা দেশে কিছু গাঁদার প্রকার আছে যাদের ফুলে কোনো গন্ধই নেই। লাল আর হলদে সাধারণত গাঁদা ফুলের রং হলেও একই ফুলে দুটি রংও দেখা যায়। আজকাল সাদা গাঁদাও পওয়া যায় যাদের বীজ ভারতের নামকরা প্রতিষ্ঠান-গুলিতে কেনা চলে (বইয়ের ফুলের তালিকা দেখুন)।

নামকরা গাঁদা ফুল পাওয়া যায় আফ্রিকায় আর ফরাসি দেশে। এই দুই দেশের ফুলের মিলনে একটি সংকর শ্রেণীও সৃষ্টি হয়েছে। নাম তার মিউল

মেরিগোল্ড। একমাত্র শীতকালেই এই তিন ধরনের গাছ থেকে ভাল ফুল পাওয়া যায়।

রোগ॥ সবচেয়ে মারাত্মক হচ্ছে ভাইরাস্ রোগ। গাছে এই রোগ দেখলেই তুলে পুড়িয়ে ফেলা উচিৎ। গাঁদা গাছ নিজেই ক্রিমি বা কীট্ (নেমাটড) প্রতিহত করতে পারে। পার্কস্ নিমাগোল্ড্ গাঁদা গাছে কোনো দিন নেমাটড্ বা ক্রিমি হবে না।

ফল-ফুল সংরক্ষণ জাম-জেলি-মালমারলেড এবং ফল-ফুল সংক্রান্ত কয়েকটি বৃত্তি॥

॥ সস্তায় ফলফুল সংরক্ষণ তথা গরিবের রেফ্রিজারেটর ॥

জীবন্ত ফল ফুল॥ ফসল বা গাছের চরম পরিণতির পরও তাদের বাষ্পমোচন-শ্বাসক্রিয়া এবং অন্যান্য জৈব-রাসায়নিক কাজগুলি সমানে চলে। ফল ফুলের জৈব প্রক্রিয়াগুলি চলে খুব ধীর গতিতে কারণ এতে ওদের সতেজ ভাবটা অনেক দিন রক্ষা হবে। খুব সাধারণ ভাবে এমন একটা প্রক্রিয়া বের করতে হবে যাতে ফলফুলের পরিবেশ থাকবে আর্দ্রতায় ভরা, বাইরের তাপমাত্রা থেকে যার তাপমাত্রা হবে কম। এই সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করে খুব কম খরচায় ৪টি প্রকোষ্ঠ বা ছোট ঘর বসাতে হবে। খরচ পত্র তথা জিনিসপত্র এমন হওয়া চাই যা নাকি আমাদের দেশের গরিবেরা সহজেই পেতে পারে। আপনার কাঁচা মালের ওপর নির্ভর করবে আপনি কটা প্রকোষ্ঠ ব্যবহার করবেন।

১নং প্রকোষ্ঠ॥ এই প্রকোষ্ঠটা তৈরি হবে খুব ক্ষুদে ক্ষুদে ফুটোওলা ইট এবং নদীপাড়ের বালি দিয়ে। মেঝে তৈরি হবে কেবলমাত্র এক সারি এধরনের ইট বিছিয়ে। দেওয়ালগুলি তৈরি হবে দু-সারি একই ইট দিয়ে এবং দু-সারি ইটের মাঝে ফাঁক থাকবে ৭·৫ সেমিঃ। এই ৭·৫ সেমিঃ ভর্তি করতে হবে শুধু বালি দিয়ে।

২নং প্রকোষ্ঠ॥ তৈরি হবে ওপরের বলা ইটের। আয়তনে ছোটো। মাঝখানে বসাতে হবে মাটির একটা গামলা। গামলাটার চারপাশে থাকবে বালি।

৩নং প্রকোষ্ঠ॥ এখানে আপনার সুবিধা মত একটা কাঠের বাক্স নিতে হবে। মাটির ১টি গামলা কাঠের বাক্সে বসাতে হবে। গামলাকে ঘিরে থাকবে বালি।

৪নং প্রকোষ্ঠ ॥ এখানে লাগবে একটা ফলের ঝুড়ি। ফলের ঝুড়িটার মাঝখানে থাকবে একটা মাটির কলসি—তাকে ঘিরে বালি।

সব প্রকোষ্ঠগুলির ইট-বালি-মাটির গামলা জলে ভাল করে ভেজাতে হবে,—যাতে ওগুলি জলে টই-টম্বুর হয়ে যায়। প্রতিটি প্রকোষ্ঠের ওপরটা ঢাকতে হবে মোটা থলে দিয়ে। এগুলিও থাকবে জলে ভেজা। থলেগুলি সকালে আর বিকেলে জলে ভেজালেই তাপ এবং আর্দ্রতা বা ভিজে ভাব ঠিক মত বজায় থাকবে।

ফলফুলে গন্ধ ঠিকমতো বজায় রাখতে অথবা যাতে বাজে গন্ধ না আসে, সেটা ঠিক রাখতে দুটি কাজ করা যায়। হয় থলে রোজ পরিষ্কার করতে হবে অথবা দু-দলের থলে রাখতে হবে। একদল যখন ব্যবহার করা হবে অপর দলকে তখন পরিষ্কার করে শুকোতে দিতে হবে।

মে-জুন মাসে প্রকোষ্ঠগুলির ভেতরের তাপ এবং ভিজে ভাব (হিউমিডিটি) এবং বাইরের তাপ আর ভিজেভাবের তুলনা করা হল :

	তাপমাত্রা % সেন্টিগ্রেডে		ভিজে ভিজে ভাব রিলেটিভ হিউমিডিটি (%)	
	সবচেয়ে বেশি	সবচেয়ে কম	বেশি	কম
	১	২	৩	৪
বাইরের তাপমাত্রা—	৩৯·১	২৪·২	৩৬·০	৯·০
১নং প্রকোষ্ঠ—	২৫·২	২৩·০	৯৭·০	৯৪·০
২নং প্রকোষ্ঠ—	২৬·০	২৩·৫	৯৭·০	৯৪·০
৩নং প্রকোষ্ঠ—	২৬·৫	২৩·৮৫	৯৭·০	৯৪·০
৪নং প্রকোষ্ঠ—	২৬·৫	২৩·৮৫	৯৭·০	৯৪·০

গরিবদের তো বটেই, ওপরের যে কোন একটি প্রকোষ্ঠ করলে বড় লোকদেরও সাশ্রয় হবে। ছোট রেফ্রিজারেটারে সব ফলমূল ধরে না। এধরনের একটা প্রকোষ্ঠ করলে অতিরিক্ত কাঁচামাল তিন দিন রাখতে পারবেন—যে সব গৃহস্থের অতিরিক্ত ফলমূল জমে যায়।

ফল ফুল চাষিদের তো কথাই নেই। তাদের জন্য-ই বলতে গেলে এই প্রকোষ্ঠগুলি বানান। বৈশাখ—জ্যৈষ্ঠ মাসে ফলফুল, বিশেষ করে ফুল এক-

দিনেই মলিন হয়ে আসে। এর যে কোন একটা প্রকোষ্ঠে রাখলে অনায়াসে তিন দিন পর্যন্ত তরতাজা থাকবে ফলফুল।

॥ ফলের জন্য ফায়ার বোর্ডের প্যাকিং বাক্স ॥

সুবিধা ॥ আজ যথেচ্ছভাবে বনজঙ্গলের গাছপালা কেটে যেভাবে অন্যান্য কাজের সঙ্গে ফলের বাক্স প্রভৃতি বানান হচ্ছে—ভয় হচ্ছে ভবিষ্যতে হয়তো তাতে প্রকৃতির ভারসাম্য পুরোপুরিই নষ্ট হয়ে যাবে। আমাদের বনসম্পদ হচ্ছে শতকরা ২৩ ভাগ যেখানে পৃথিবীর গড় হচ্ছে ৩৩%।

বিভিন্ন কাজে কাঠ লাগে ১৩৮ লক্ষ টন ঘন মিটার। তার মধ্যে শুধু আপেল স্থানান্তরে পাঠাতেই লাগে ৭·২৬ লক্ষ ঘন মিটার।

ফায়ার বোর্ড প্যাকিং বাক্স তৈরি হচ্ছে ক্রাফ্‌ট কাগজ থেকে। ক্রাফ্‌ট কাগজ তৈরি হচ্ছে কাঠের নরম অংশ এবং ধান গম প্রভৃতির বিচুলি এবং আখের ছিবড়ের সেলুলোজ দিয়ে।

ফায়ার বোর্ড প্যাকিং বাক্সের সুবিধা ॥ প্রথম সুবিধা হল, এই বাক্সগুলিতে ২০ থেকে ৩০% কাঠ কম থাকবে। ফলে বাক্সগুলির ওজন হয়ে যাবে খুব কম এবং পরিবহণে বেশ পয়সা বাঁচবে। ভরতি করতে বাক্সতে ফল কম চোট খাবে এবং একটি প্যাকিং বাক্সে ৭-৮টি স্তর ফল সাজান চলবে। দরকার পড়লে অর্থাৎ অকেজো হয়ে গেলে বাক্সগুলি কাগজ তৈরির জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। বাক্সগুলি পরিবহণের সময় পাঠাতে সহজেই সিল-ছপ্পর মারা যায় বা ঠিকানা ছাপান যায়। খরচও তাতে কম। সবচেয়ে বড় লাভ,—বাক্সগুলি সহজে পচে না। বিদেশে এধরনের বাক্সের যথেষ্ট চাহিদা।

অসুবিধা ॥ খরচাটা খুবই বেশি। কাঠের বাক্সের দাম ৫-৭ টাকা হলে ফায়ারবোর্ড বাক্সের দাম পড়বে ১৫ টাকা। অবশ্য দামটা বেশি হয় কেন্দ্রিয় আর রাজ্য সরকারের ট্যাক্সের জন্য। ট্যাক্স মকুব হলে দাম অনেক সস্তা হবে।

॥ ফলফুলের সংরক্ষণ ॥

ফলফুলের চাষের সঙ্গে যদি ফলফুলকে জিইয়ে রাখা বা ফলফুলের ভেতরকার গুণগুলি নিয়ে আমরা অন্য নতুন কোনো খাবার বা রাসায়নিক দ্রব্য মিশিয়ে নির্যাস তৈরি না করি তাহলে ফলফুলের চাষ অনেকটাই ব্যর্থ হবে। আপনাকে ধরে নিতে হবে আপনার সব কাঁচামাল আপনি চালাতে

পারবেন না। অথবা অনেক সময় দেখা যায় কাঁচা মালটা কাঁচামাল (এখানে ফলফুল) হিসেবে বিক্রি না করে যদি ওর থেকে অন্য কিছু তৈরি করে বিক্রি করেন তবে আপনার আয় বেশি হবে। তখন নিশ্চয়ই আপনি দ্বিতীয় পথটাই বেছে নেবেন।

আমাদের সৌভাগ্য আমরা ফলের বেলায় এ সুযোগটা খুবই বেশি পাচ্ছি। যেমন—আম থেকেই ধরুন, শুধু শুকিয়ে আমসি, আমসত্ব, জ্যাম-জেলি মারমালেড কত কি বানাতে পাচ্ছি। সত্যি কথা বলতে পশ্চিমবাংলায় সবকটি ফল থেকে এ সুযোগ আমরা পেতে পারি, যেমন—পেয়ারা, আনারস প্রভৃতি। আবার সবচেয়ে আনন্দের খবর হল,—মোরব্বা-জ্যাম-জেলি বানাতে খুব একটা কাঠখড় পোড়াতে হয় না, বা ছুটে গিয়ে কলকারখানায় ট্রেনিংও নিতে হয় না—হোকনা নামগুলি ইংরাজীর।

আমাদের দুঃখটা হল ফুলকে নিয়ে। পশ্চিমবাংলায় ফুলকে শুধু ফুল হিসেবেই বিক্রি করতে হবে। কারণ বাঙ্গালোর বা হায়দ্রাবাদের মত আমাদের এখানে আজও ফুল থেকে নির্যাস বের করবার কোনো কলকারখানা তৈরি হল না। জানি আমাদের দেশের আবহাওয়া বাঙ্গালোরের মতো নয়। সেখানে মনে হয় চির বসন্ত। শহরটাই যেন ফুলের বাগান। প্রচুর পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয় ফুল নিয়ে। সুতরাং ফুল থেকে যে বিভিন্ন সুগন্ধী নির্যাস বের করে দুটি পয়সা পাবেন ফুল চাষিভাই এতে আর আশ্চর্যের কি। তবে আশার কথা হল পশ্চিমবাংলায় ফুল নিয়ে যে মাতামাতি সুরু হয়েছে ভরসা হচ্ছে আমাদের এই অঞ্চলেও একদিন ফুল থেকে সেণ্ট-আতর এসব হবে।

॥ ফলের সংরক্ষণ ॥

রাজনৈতিক বিপ্লব আসে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে কিন্তু সামাজিক আর আহারের ব্যাপারে পরিবর্তন আসে ধীর গতিতে। পশ্চিমবঙ্গের যে মানুষটি এখন রোজ একবেলা রুটি খাচ্ছে, সে জানেনা কবে থেকে সে রুটি খেতে আরম্ভ করেছে। কিছু দিন আগেও আমাদের মা-মাসি-পিসিরা নিয়মিত আচার-মোরব্বা-পাঁপড়-চাটনি-আমসত্ব-ডালের বড়ি বানাত। এবং সেগুলি বানাতে যেন উৎসব লেগে যেত। আজকের দিনে আমাদের দিদি-বৌদিরা এগুলি জানে না। জানবার তাদের সময়টা কোথায়? তাই বলে কি আমরা ওসব খেতে ভুলে গেছি? মোটেই না। মা-মাসি-বোনদের অফুরন্ত সময় হারিয়ে গেলেও সেই হারান

সময়কে গাঁটে পুরে বেকার ভায়েরা তাদের বেকারত্ব ঘোচাচ্ছেন। এখন প্রায় সব স্টেশনারি দোকানেই আচার-কাসুন্দি থেকে জ্যাম-জেলি সব কিছুই পাওয়া যাচ্ছে। বাজার আছে আর সহজেই তৈরি করা যায় এমন কিছু ফলজাত সংরক্ষিত খাবার তৈরির কথা এবার বলব।

এখানে অর্থাৎ ফলের সংরক্ষণে আর ফলজাত খাবার তৈরিতে যেসব ওষুধ-পত্রের কথা বলব তা সবই যে কোন ডাক্তারের কেমিষ্টের দোকানে পাবেন। ওষুধ বা রাসায়নিক জিনিসগুলির নাম শুনে ঘাবড়ে যাবার কিছু নেই।

॥ ফলের রস ॥

এর আওতায় সবগুলি ফলই আসবে যা আমি এই বইটায় বলেছি। বিশেষ করে আসবে,—আম-আনারস-ফলসা প্রভৃতি। ফলগুলিকে প্রথমে টুকরো টুকরো করে কেটে ঝুড়িতে বা চালুনিতে বা যন্ত্রে চেপে রস বার করতে হবে। অবশ্যই ফলগুলি পাকা হওয়া চাই। এবার রসটাকে ছেঁকে নিতে হবে পরিষ্কার কাপড়ে বা নাইলনের ছাঁকনিতে। এরপরই রসে লিটার প্রতি ০·৪৩ গ্রাম সিরিশ (জিলেটিন) মেশাতে হবে। রস ভালভাবে মিশিয়ে ১৫-২০ মিনিট ধরে থিতুতে হবে। ওপরকার স্তরের স্বচ্ছ রস আস্রাবণ প্রক্রিয়ায় আলাদা (বা ছেঁকে তুলে নিয়ে) করা হয়। এবার প্রতি লিটার রসে ৬২ গ্রাম চিনি যোগ করতে হবে। প্রয়োজন হলে দ্বিতীয় বার ছাঁকতে হবে।

ফলের রস ৭১·১০ সেন্টিগ্রেডে গরম করে নির্বীজন করা হয়। গরম করবেন আধঘণ্টা ধরে। তারপর ঠাণ্ডা করে কাঁচের শিশি বা পলিথিনের বোতলে ভর্তি করে, হাওয়া না ঢোকে এমনভাবে ছিপি এঁটে দেবেন। এরপরই আপনার পছন্দমত লেবেল এঁটে বাজারে পাঠাবেন।

•

॥ স্কোয়াশ ॥

রসালো যে-কোনো ফল আম-আনারস-লেবু প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্যে বা ঝুড়িতে চেপে রস বের করে নেওয়া হয়। হ্যাঁ, প্রক্রিয়াটি ওপরের মত অনেকটা। আমের খোসা ছাড়িয়ে চালুনিতে চেপে রস বের করা হয়। রসাল আম হলে হাত দিয়ে চেপে রস বের করা চলে।

রসের সঙ্গে এবার চিনি, যে কোনো লেবুর রস, রং এবং বার্লি করতে হলে যবের পাউডার মেশাতে হবে। যবের বা বার্লির পাউডার অল্প জল দিয়ে লেই

করে পরে ঘরে ঠিক যেভাবে বার্লি করে সেভাবে জল দিয়ে ফুটাতে হবে। সমস্ত উপাদানগুলি তৈরি করে একবার ছেঁকে নিতে হবে। এরপরই ঐ রসে মেশাতে হবে লিটার প্রতি ০·৭১ গ্রাম পটাশিয়াম্ মেটাবাইসালফাইট সামান্য জলে গুলে। এরপরই স্কোয়াশকে পরিষ্কার বোতলে বা পলিথিন কনটেনারে বোতলজাত করতে হবে। বাজারে ছাড়বার আগে আপনার লেবেল প্রভৃতি সেঁটে দিন।

উপাদান	কমলালেবুর স্কোয়াশ	কাগজিলেবুর স্কোয়াশ	আমের স্কোয়াশ	কাগজিলেবু ওবার্লিরজল	আনারসের স্কোয়াশ	গ্রেপফ্রুটের স্কোয়াশ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
রস—	৫ লিটার	৫ লিটার	১ লিটার	৫ লিটার	৫ লিটার	৫ লিটার
চিনি—	৬ কিগ্রাঃ	৬·২৫ কিগ্রাঃ	১ কিগ্রাঃ	৬·২৫ কিগ্রাঃ	৬ কিগ্রাঃ	৬ কিগ্রাঃ
লেবুর রস—	৩৭৫ গ্রাঃ	—	৩০ গ্রাঃ	—	৩৭৫ গ্রাঃ	৩৪০ গ্রাঃ
জল—	৩·৫ লিটার	৩·৫ লিটার	১ লিটার	৩·৫ লিটার	৩·৫ লিটার	৩·৫ লিটার
রং (খাবার)	উপযুক্ত পরিমাণ	—	—	—	—	—
যব বাবার্লির পাউডার নির্যাস	—	—	—	৯০ গ্রাঃ	—	—
	৯০ গ্রাঃ (কমলা)				৯০ গ্রাঃ (আনারস)	
পটাশিয়াম্ মেটাবাই-সালফাইট্	লিটার প্রতি ০·৭১ গ্রাঃ	লিটার প্রতি ০·৭১ গ্রাঃ	লিটার প্রতি ০·-১ গ্রাঃ	লিটার প্রতি ·৭১ গ্রাঃ	লিটার প্রতি ০·৭১ গ্রাঃ	লিটার প্রতি ০·৭১ গ্রাঃ

॥ সরবত (সিরাপ) ॥

গোলাপ-খসখস-চন্দন-ক্যাওড়া প্রভৃতির সিরাপ/সরবত জলে চিনি ফুটিয়ে করবেন, এবং চিনি যাতে দানা না বাঁধে তার জন্য অল্প পরিমাণে লেবুর রস দিবেন। সাড়ে তিন কিলো গ্রাম চিনি, সাড়ে তিন লিটার জল, এবং ১৬ গ্রাম লেবুর রস মিশিয়ে ১০ থেকে ১৫ মিনিট ধরে সমস্ত উপাদানগুলি ফুটিয়ে যেতে হবে যতক্ষণ না সরবত ঘন হচ্ছে। এরপরই সুগন্ধ আনবার জন্য গোলাপ-খস্‌খস্-চন্দন-ক্যাওড়ার যে-কোনো একটি মেশাতে হবে গরম সরবত ঠাণ্ডা হবার পর।

॥ জ্যাম-জেলি- মারমালেড্ ॥

যে ফলের জ্যাম করতে চান সেই ফলগুলিকে পরিষ্কার ভাবে ধুয়ে টুকরো টুকরো করতে হবে। কাটা ফলগুলি নরম করবার জন্য সামান্য জল দিয়ে ফোটাতে হবে। এরপর প্রতি ২ কিলোগ্রাম ফলের জন্য ২½ কিলোগ্রাম চিনি, ৭ গ্রাম মত লেবুর রস দিয়ে ঘেঁটে ১০৫° সেন্টিগ্রেডের তাপে ফুটিয়ে যেতে হবে যতক্ষণ না ফলটা জ্যামের আকার/রং নিয়ে ঘন হচ্ছে। ফল যদি খুব মিষ্টি হয়, তবে চিনির পরিমাণ কমবে। এরপরই এদের নানা আকারের শিশি/পলিথিন কনটেনারে ঢুকিয়ে বন্ধ করে সিল করে দিতে হবে।

॥ পেয়ারা-আম-আনারস প্রভৃতির জেলি ॥

ফলগুলি ধুয়ে খোসা উঠিয়ে খুব পাতলা পাতলা টুকরো করতে হবে। এবার ফলগুলি ডুবে যায় এমন পরিমাণ জলে দিতে হবে। এরপর এক কিলোগ্রাম ফলে ১·৪০-২·১৫ গ্রাম লেবুর রস দিতে হবে। এবার ফলগুলি ২৫-৩০ মিনিট ফোটাতে হবে যতক্ষণ না ফলের টুকরোগুলি ঘন হয়ে আসে। ঘন পদার্থে এবার কিলোপ্রতি (অনুমানে) ৮০০ গ্রাম থেকে ১ কেজি চিনি দিয়ে ১০৫° সেন্টিগ্রেড তাপ পর্যন্ত ফোটাতে হবে। এবার চামচে সামান্য পরিমাণে ফোটান পদার্থ নিয়ে গড়িয়ে যেতে দিতে হবে। যদি পদার্থটা আঁশের মত ফোঁটা হয়ে পড়ে তবে বুঝতে হবে জেলি তৈরি হয়েছে। জেলি কয়েক মিনিট ধরে ঠাণ্ডা করে বোতল/পলিথিন প্যাকে ভরতি করে মুখ খোলা রাখতে হবে। এভাবে জেলি ১০-১২ ঘণ্টা জমতে দিয়ে মুখ বন্ধ করে দিতে হবে।

॥ মারমালেড্ ॥

নামটা শুনে ঘাবড়ে যাবার কিছু নেই। জেলির মতই জিনিস এটা। আগে তৈরি হত লেবুজাতীয় ফল থেকে। এখন স্টেশনারি দোকানে—আম-পেয়ারা-আনারস প্রায় জেলির সবগুলি ফল থেকেই তৈরি মারমালেড্ পাওয়া যাচ্ছে। অনেকে মালটা অথবা সাতগুড়ি এবং খাট্টা (টক কমলালেবু) অথবা গল গল ২·১ অনুপাতে ব্যবহার করেন। খোসার বাইরেটা খুব পাতলা করে ছাড়িয়ে নিতে হবে। খোসা ছাড়ানো ফলগুলি পাতলা টুকরো করে ওদের ওজনের ২-৩ গুণ জল দিয়ে ঢেকে দিতে হবে এবং ৩০ মিনিট ধরে ফোটাতে হবে। চাপ দিয়ে রস বের করে প্রতি কিলোগ্রাম রসের সঙ্গে ৮০০ গ্রাম থেকে ১ কিলোগ্রাম চিনি দিতে হবে। কিছু খোসা খুব ছোট ছোট করে কেটে (১৮-২৫ মিলিমিটার) জলে ফোটাতে হবে যতক্ষণ না ঐ ছোট টুকরোগুলি নরম হয়ে যায়। পরে

জলটা ফেলে দিতে হবে। এবার রসের তাপমাত্রা যখন ১০৩·৩° সেগ্রেঃ পৌছবে তখন ঐ খোসার টুকরোগুলি রসে ফেলে দিয়ে ১০৫° সেগ্রেঃ পর্যন্ত ফোটাতে হবে। পেয়ারার জেলির মতই হবে রসের শেষের দিকটা। এরপরই রস ঠাণ্ডা করে জ্যাম-জেলির মত বোতল/কৌটায় ভরতে হবে।

॥ মোরব্বা ॥

ঘন সিরাপের মধ্যে শুকানো ফল অথবা সবজিকে বলে মোরব্বা। সবচেয়ে জনপ্রিয় মোরব্বা হচ্ছে আম-বেল-আপেল-চালকুমড়ো-গাজর-আমলকি-হরতকি।

আমলকির বীচি বের করে সিদ্ধ করা হয়। আপেল খোসা ছাড়িয়ে বীচি বের করে সিদ্ধ করা হয়। বেলেরও তাই। হরতকি, চালকুমড়ো টুকরো করে কেটে, খোসা ছাড়িয়ে বীচি তুলে নিয়ে চুনের জলে ১০-১২ ঘণ্টা ডুবিয়ে রাখার পর সেদ্ধ করা হয়। সেদ্ধ করা ফল এবং চিনি (তৈরি ফলের ওজনের অর্ধেক) পর পর স্তর করে সাজিয়ে রাখতে হবে ২৪ ঘণ্টা ধরে। এ সময় ফলগুলি থেকে অতিরিক্ত জল বেরিয়ে যায়। ফলে চিনি যাবে গলে। সাধারণত সিরাপের ব্রিক্ প্রায় ৩৫° সেগ্রেঃ হতে হবে। ২৪ ঘণ্টা পরে আরও চিনি দিয়ে সিরাপের শক্তি ৬০° ব্রিক্-এ তোলা হয়। গোড়ায় ব্যবহার করা ১০০ কিলোগ্রাম চিনিতে ৬২-১২৪ গ্রাম লেবুর রস অথবা টার্টারিক অ্যাসিড যোগ করা হয়। সমস্ত জিনিসটি এরপর ৪-৫ মিনিট ধরে ফোটানো হয় এবং ২৪ ঘণ্টা দিতে হবে জমতে। তৃতীয় দিনে সিরাপের শক্তি ৬৮° সেগ্রেঃ ব্রিক্-এ বাড়িয়ে পুরো রস এবং ফল/সবজি আবার ৩-৪ মিনিট ফোটাতে হবে। ফলগুলি এবার ৩-৪ দিন সিরাপের মধ্যে রাখতে হবে। শেষবারে সিরাপের শক্তি বাড়িয়ে ৭০° সেগ্রেঃ ব্রিক্-এ আনা হয়। এরপরই মোরব্বা তৈরি হবে সমস্ত জিনিসটা ঠাণ্ডা হলে। কাঁচ/পাথর/পলিথিন বোয়ামেও রাখতে পারেন অথবা শুকনো আবহাওয়া হলে স্তূপ করে কাঠের বারকোশেও রাখতে পারেন।

মন্তব্য ॥ ব্রিক্ একটা মাপ। এই মাপে বোঝান হয় ১৭·৫° সেলসিয়াসে মোরব্বায় শতকরা কত চিনি (সুকরোজ) রয়েছে। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে চালকুমড়ার মোরব্বা চট করে একদিনে সফল হওয়া যায় না। এটা আমার অভিজ্ঞতা।

॥ আমের আচার ॥

কাঁচা বড় আম পরিষ্কার করে জলে ধুয়ে, খোসা ছাড়িয়ে টুকরো করে

কাটতে হবে আঁঠি ফেলে দিয়ে। আমের রং যাতে কালো না হয় তার জন্য আমের টুকরোগুলি লবণ রসে রাখতে হবে। ১ কিঃ গ্রাম আমের টুকরোতে ২৫০ গ্রাম লবণ দিতে হবে এবং পাত্রটি ব্যবহার করবেন চীনা মাটির এভাবে আমের টুকরোয় ৩-৫ দিন রোদ লাগাতে হবে। মোটা করে গুঁড়ো করা মেথি ১২৫ গ্রাম, মোটা করে গুঁড়ো করা কালজিরে ৩২ গ্রাম, এবং হলুদ গোলমরিচ-মৌরি গুঁড়ো প্রতিটি ৩২ গ্রাম এবং টাটকা সরষের তেল দিয়ে আমের টুকরোগুলো ভাল করে মাখতে হবে। এরপরই আগের বলা যে কোন পাত্রে চেপে বোঝাই করে একদম ওপরে একটা তেলের স্তর (অবশ্যই সরষের তেল) দিয়ে মুখটা এঁটে বন্ধ করে দেওয়া হয়। এবার মাঝে মাঝে পাত্রটি রোদে দিতে হবে। ২-৩ সপ্তাহের মধ্যেই আমের আচার কাঁচ/পলিথিন বোতলে করে বাজারে পাঠাবার উপযোগী হয়।

॥ **আমের চাটনি** ॥

পাকা আম অথচ নরম নয়, সেগুলিই চাটনির জন্য বাছা হয়। আম ধুয়ে খোসা ছাড়িয়ে টুকরো টুকরো করে কাটা হয়। এবার আমের অম্লত্ব বা কতটা টক হবে সেটা বুঝে লবণ জলে রাখতে হবে। যদি মিষ্টি হয় তবে সরাসরি চাটনির জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। লবণ জলে থাকবে ১৫% লবণ। লবণ জল ব্যবহার করা হলে চিনিতে আমের টুকরো রাখবার আগে সম্পূর্ণভাবে লবণ জল তুলে ফেলতে হবে। প্রতি কিগ্রাঃ আমের টুকরোর জন্য ১ কিগ্রাঃ চিনি, ৬৩ গ্রাম লবণ, ৬ গ্রাম টুকরো রসুন, ১৬ গ্রাম গুঁড়ো করা লাল লঙ্কা, ১২৫ গ্রাম সিরকা বা জেলি, ৩২ গ্রাম কুচান পিঁয়াজ, ১২৫ গ্রাম কাঁচা আদা চাটনিতে মেশাতে হবে।

টুকরোগুলি নরম করার জন্য সামান্য পরিমাণ জলে গরম করা হয় এবং চিনি দিতে হয়। বাকি উপাদানগুলি আলগাভাবে কাপড়ের থলেতে বেঁধে যোগ করা হয়। একইভাবে সিরকা দিতে হবে এবং ৫ মিনিট ধরে ফোটাতে হবে। মসলার থলি তুলে নিয়ে সম্পূর্ণ জিনিসটা ঠাণ্ডা করে নিলেই চাটনি তৈরি হবে। চাটনি আগের মতই কাঁচের শিশি, বোতল বা পলিথিন প্যাকে করে বাজারে পাঠান হয়।

॥ **সিরকা** ॥

দাগি-ঝরে পড়া ফল, অথবা ফলের শাঁস এবং ছিবড়ে যা সাধারণত ফেলে দেওয়া হয় তাও ব্যবহার করা চলে। যেসব ফলের মধ্যে ১০-১২ ভাগ চিনি

থাকে, যেমন আঙ্গুর-আপেল-কমলালেবু-আম-খেজুর অথবা আমের রস সেগুলিই সিরকা তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। ফল বা ফলের টুকরো ধুয়ে দরকার পড়লে থেঁতো করে সেদ্ধ করা হয়, এবং রস ঝুড়িতে চেপে বের করে নেওয়া হয়। জল অথবা চিনি মিশিয়ে রসের শর্করার পরিমাণ শতকরা ১২-১৫ ভাগে আনা হয় রস গরম করে। রস গরম করে প্রায় ফোটবার মত হলে রস বীজাণু শূন্য বড়, সরু গলাযুক্ত, কাঁচের অথবা চীনা মাটির বোতল বা পাত্রে ⅔ অংশ ভর্তি করে রাখা হয়। বিশুদ্ধ মদের কিণ্ব (কালচার)—যেটা যে কোন মদের ভাঁটি বা গবেষণাগারে (বিধানচন্দ্র কৃষি বিদ্যালয়, মোহনপুর নদীয়া, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, নদীয়া) পাওয়া যাবে এবং সেই কিণ্বটি রস গাজানর জন্য ঐ বোতলে ফেলে দিতে হবে, এবং বোতলের মুখ তুলো দিয়ে বন্ধ করতে হবে যাতে গ্যাস বের হয়ে যেতে পারে। এবার বোতলটা ঘন ঘন নেড়ে বোতলের ভেতরকার পদার্থের তাপ ২৫°—২৬·৭° সেগ্রেঃ রাখতে হবে। সুরাসারে গাঁজানো সম্পূর্ণ হবার পর যখন রসের ব্রিক্-৩° সেগ্রেঃ তখন বোতল ১-২ সপ্তাহ তুলে রাখা হয় এবং থিতুতে দেওয়া হয়। পরিষ্কার তরল পদার্থটি সাইফন যোগে অন্য একটি পরিষ্কার পাত্রে ⅔ অংশ ভর্তি করা হয় এবং মূল সিরকা (পাস্তুরিকৃত নয় এমন সিরকা) ১ : ১০ এই অনুপাতে মেশানো হয়। ছোট গর্তযুক্ত ছিপি পাত্রের মুখে লাগানো হয় বাতাম্বিত করার জন্য এবং তাপ ২৫°-২৬·৭° সেগ্রেঃ-এ বজায় রাখার জন্য। এখন কিন্তু পাত্রটি নাড়া-চাড়া করা যাবে না। কারণ তরল পদার্থটির ওপর জীবাণুর একটি পাতলা স্তর তৈরি হয়—নাড়াচাড়ার ফলে স্তরটি যাবে ভেঙে। প্রায় ৮-১০ সপ্তাহের মধ্যে গাঁজান সম্পূর্ণ হয়ে যায় যার পরে সিরকা সাইফন যোগে বের করে নিয়ে প্রায় ৬ মাসের জন্য পুরাতন হতে দেওয়া হয়। এর পরই পরিষ্কার তরল পদার্থটি বের করে নিয়ে কয়েক স্তর কাপড়ের মধ্য দিয়ে ছেঁকে খোলা পাত্রে ৬৫·৬° সেগ্রেঃ গরম করে বোতলে তোলা হয়।

॥ ফলের টফি ॥

সত্যিকারের ফলের টফি আম-সফেদা-পেয়ারা-কাঁঠাল ইত্যাদি ফলের রস, ফলের শাঁস, মাখন তোলা দুধের গুঁড়ো, চিনি এবং গ্লুকোজ-এর সঙ্গে ফুটিয়ে করা যেতে পারে। একটি আদর্শ প্রণালীর বিবরণ নিচে বলা হচ্ছে।

ফলের শাঁস—২৪ কিগ্রাঃ
চিনি——১৩·৬ কিগ্রাঃ
গ্লুকোজ——১·৮ কিগ্রাঃ

শাঁস প্রথমে গাঢ় করে ওর ⅓ অংশে আনা হয়, অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে মিশিয়ে শাঁসের প্রাথমিক ওজনের ⅔ অংশে আনা হয়। যখন সমস্ত জিনিসটা বেশ ঘন হয়ে যায় তখন ঐ জিনিসটা তেল মাখান কোন পাত্রে ঢেলে ঠাণ্ডা করে, টুকরো টুকরো করে কেটে কাগজে মুড়ে বাজারে ছাড়া যায়। এই টফি-গুলি সাধারণ টফির মত নয়। এতে প্রচুর পরিমাণে শাঁস থাকে। বাচ্চারা পছন্দও করে ভালো।

॥ বেকারত্ব থেকে মুক্তির কিছু নতুন ভাবনা-চিন্তা ॥

বইয়ের প্রথমে যা বলেছি,—অর্থাৎ ছাপোষা মানুষ বাড়ি তৈরি করার পর বাড়িটা ঘিরে কিভাবে সাজাতে পারে এটা তারই একটু বিশদ আলোচনা। আমরা ধরে নেব বাড়ির মালিক বাগান করা, লন করা, বেড়া দেওয়া, হেজ তৈরি করার বিষয়ে একেবারে অনভিজ্ঞ বা তার ফুরসৎ নেই বাগান প্রভৃতি তৈরি করতে। কিন্তু ইচ্ছা আছে ষোল আনা। কে না চায় তার বাড়ি বাগানকে লোকে প্রশংসা করুক। হোকনা সে বাড়ির বাগান ছোট। সত্যি কথা বলতে যা দিনকাল পড়েছে,—ছোট বাড়ি, ছোট বাগান করাই মানুষের পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এও দেখা গেছে শখ করে মানুষ কলকাতার আশপাশে বিরাট বাগানবাড়ি করে ছিলেন এককালে। কিন্তু তাঁদের পর-পুরুষদের সাধ্য নেই বাগানবাড়ি যথাযথ রাখতে। ফলে বাগান তছনছ, আর বংশধরেরা বাড়ির ইট খুলে পরস্পরের সঙ্গে মারামারি করছে। আজকাল স্বামী-স্ত্রীদের একটি দুটির বেশি বাচ্চা নেই। সুতরাং যা কিছু আমরা করব,—ভেবে চিন্তে ছোট মাপের করাই বোধ হয় যুক্তিযুক্ত।

বাড়ির সামনে লন তৈরি করা ॥ অনেকের দেখেছি বাড়ির সামনের জমিটা কি করবেন ভেবে পান না। ফুল বাগান করবেন না কিছু টাকা জমিয়ে আরেকটা ঘর তুলে ভাড়া দিয়ে কিছু টাকার মুখ দেখবেন? যাই করুন সেটা করতে যখন সময় লাগছে, তখন আপাতত ওটাকে লনে পরিণত করতে ক্ষতি কি? 'লন' ইংরাজি শব্দটা শুনে ঘাবড়াবার কিছু নেই। 'লন' হচ্ছে সুন্দর ভাবে ঘাসে ছাওয়া একখণ্ড জমি। রং আর ঘাস দেখে মনে হবে কে যেন একখণ্ড কার্পেট বিছিয়ে রেখেছে। বেকার ভাইদের প্রতি আমার অনুরোধ 'লন' তৈরির ব্যাপারটা ভালো করে পড়ে নিয়ে নতুন বাড়ি তৈরি হয়েছে ও খালি জমি পড়ে রয়েছে কিছুটা এমন বাড়ির মালিককে লন তৈরির প্রস্তাবটা দিতে।

লনের জন্য জমি তৈরি করা॥ সারাদিন রোদ পড়ে এবং জল দাঁড়ায় না এমন জমি লনের জন্য বেছে নিতে হবে। জমি কোপাবেন এক হাঁটু গভীর করে। কাশ বা উলুখড় রয়েছে এমন জমিতে কোপাতে হবে এত গভীর করে যাতে কোন শিকড়-বাকড় না থাকে। লনের জমি তৈরি করবেন গরমের প্রথম দিকে। যদি সম্ভব হয় লনের ওপরের ঘাসের চাপড়া নিয়ে একেবারে মাটি প্রথমে ফেলবেন। অর্থাৎ এই ব্যবস্থায় আপনাকে দু-ফুট গভীর করে মাটি তুলতে হবে। জমির ওপরের স্তর অর্থাৎ যেখানে ঘাস-শিকড় রয়েছে সেটা একেবারে গর্তের তলায় থাকবে। সোজা কথায় জমি ওলট-পালট করা।

জমি সমান করা॥ জমির ওপরটা সমান করতে হবে,—যাতে জল না দাঁড়ায়। ছোট লন হলে পাশের জমি থেকে একটু উঁচু করবেন। লন ঢালু হলে জল বেরবার ব্যবস্থা রাখবেন। লনের জমি মোটামুটি সমান করার পর জমিটার পাশগুলি আধ ফুট মত উঁচু করে বেঁধে দেবেন। এবার জল ঢাললে বুঝতে পারবেন কোথায় কোথায় জল জমছে। জায়গাগুলিতে চিহ্ন দিন। তার পরই জায়গাগুলি গুঁড়ো মাটি দিয়ে ভরাট করে দিন। কিছু দিন বাদে আবার এই কাজটা করবেন—ফলে নিশ্চিত হতে পারবেন জমি ঠিক হল কিনা। মনে রাখবেন ঘাসের জমিতে জল জমলে দূর্বা ঘাস ভাল জন্মায় না এবং তাদের অসুখ-বিসুখও করে।

পাঠক হয়তো ভাবছেন—দূব্বো ঘাসই যখন জন্মাবে তখন সাত সতেরোর অত দরকার কি? হ্যা দূর্বা ঘাস জন্মানোই তো কঠিন! কারণ 'লনে' বুনো ঘাস জন্মিয়ে লনের বারটা বাজিয়ে দেয়।

ঘাস জন্মানো॥ আগেই বলা হয়েছে ঘাসের জন্য দূর্বা লাগান হয়। দূর্বা লাগানো হয় দুভাবে,—কেটে লাগানো এবং দূর্বার বীজ বোনা। দূর্বা কেটে লাগানো সবচেয়ে সুবিধের। কেটে লাগাবার জন্য কাছাকাছি গাঁট রয়েছে এমন এবং কিছুটা পুরানো এমন দূর্বা ঘাস বেছে নিতে হবে। তিন-চারটি এমনি ধরনের দূর্বা কাটিংয়ের গোছা তিন ইঞ্চি দূরে দূরে বসাবেন। গোছা বসাবেন গভীর করে। গোছা বসাবেন বর্ষার মুখটায় যাতে বৃষ্টিজলের সুবিধাটা পাওয়া যায়। বৃষ্টির সাহায্য না পাওয়া গেলে মাঝে মাঝে দূর্বা ঘাসগুলি জলে দেবেন ভিজিয়ে। ঘাস উঠতে আরম্ভ করলে মাঝে মাঝে হালকা রোলার ব্যবহার করবেন। ঘাস ছাঁটার মত হলে ঘাস ছাঁটবেন ঘাস ছাঁটার কাচি দিয়ে। জমি ভালভাবে তৈরি হলে রোলার ব্যবহারের দরকার নেই।

যদি মনে করেন যে জমিতে লন হবে সে জমির সারের অভাব, তাহ'লে ভাল হয় যদি মাটি পরীক্ষা করিয়ে নিতে পারেন। সারের ব্যাপারে নিজের অভিজ্ঞতায় নিশ্চিত হলে জমির ওপরে ইঞ্চি খানেক পরিমাণ পাতাসার ছড়িয়ে দেবেন। পাতাসার তৈরি করবেন অর্ধেক পাতা পচা (গ্রীন্ কম্পোষ্ট) এবং অর্ধেক গুঁড়ো মাটি দিয়ে। দূর্বা বীচি ছড়াতে হলে সবসময় অর্ধেক বীচি ও অর্ধেক বালি এই নিয়মে মেশাবেন। বিশেষ হাওয়া নেই এমন দিনে ঘাসের বীচি ছিটোবেন।

ঘাসের জমিতে প্রথম দিকটায় অর্থাৎ যখন গোছা বা বীচি ছড়িয়ে দিয়েছেন তখন জল দেবেন ঝাড়িতে করে যেমন বীজ তলায় জল দেয়।

ঘাস ছাঁটা ও রোলিং॥ গরম আর বর্ষাকালে লন মোয়ারের (ঘাস ছাঁটার যন্ত্র) ছুরি দিয়ে ঘাস ছাঁটা ভাল। ছুরি থাকবে জমি থেকে তিন সেমিঃ দূরে। শীতকালে ঘাস যত মাটির কাছাকাছি নাবাতে পারবেন তত ভাল। মাসে দু-তিনবার রোলার ব্যবহার করতে পারলে ভাল হয়। জমি সমান থাকলে রোলার ব্যবহারের দরকার নেই।

সার দেওয়া॥ বর্ষার আগে আর পরে ঘাস ছাঁটাই করে জমিতে সার দেবেন। দেখবেন সার দেওয়া দূর্বার সঙ্গে অন্য দূর্বার পার্থক্য। প্রথম বছর সার দেবার দরকার নেই। সারমাটি তৈরি করবেন সমান পরিমাণের পাতা পচাসার, হাড়ের গুঁড়ো আর মিহি মাটি গুঁড়ো মিশিয়ে। আবার অগ্রহায়ন থেকে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত মাসে একবার করে দু'গ্যালন জলে ২৮ গ্রাম এমোনিয়াম সালফেট গুলে লনে দিতে হবে। বাজারে লনে ব্যবহার করবার সারও পাওয়া যায়। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে এটা ব্যবহার করবেন।

লনে জল দেওয়া॥ লনে দিন সাতেক অন্তর হোস্ পাইপ করে জল দেবেন একেবারে ভিজিয়ে। শীতকালে দেবেন পনেরো দিন অন্তর।

পরিচর্যা-কৃষ্টি॥ শীতকালে সকালে লনের ঘাসে শিশির জমে থাকে। লম্বা বাঁশ দিয়ে ঐ শিশির ঘাসের গোড়ায় ফেলে দিন। জলের কাজ হবে। বর্ষাকালে কেঁচো মাটি তুলে ছোট ছোট ঢিবি তৈরি করে। সকালে দেখলেই ভেঙ্গে দেবেন। বেলা বাড়লে ঢিপি শক্ত হয়ে যাবে, ভাঙতে কষ্ট হবে। কেঁচো মারবেন না। ওরা জমির উপকার করে।

দূর্বা ছাড়া সব ঘাসই জংলি ঘাস। জংলি ঘাস তুলবেন শেকড়শুদ্ধ। সার নিয়মিত দিলে দূর্বাদলের নিচে জংলি ঘাস চাপা পড়বে বাড়তে পারবে

না। লনে জল যেন জমে না। জলে গ্যালন প্রতি ২৮ গ্রাম পটাশিয়াম পারম্যাংগানেট দিয়ে শেওলা এবং গ্যালন প্রতি ১৪ গ্রাম পটাশিয়াম পারম্যাংগানেট দিলে কোঁচো মাটির ওপরে উঠে আসবে। তখনই কেঁচো ধরে ধরে বাইরে ফেলে দেবেন। অনেক সময় দেখবেন লনে গোল হয়ে ঘাস শুকিয়ে যায়। একে বলা হয় ফেয়ারি-রিং। এ রোগ সারাতে গ্যালনে ২৮ গ্রাম কপার সালফেট মিশিয়ে ছড়িয়ে দেবেন। লনে খুব বেশি জংলি ঘাস জন্মালে নতুন করে লন তৈরি করতে হবে। অথবা ঘাস শিকড় সমেত বেশ কয়েক ইঞ্চি মাটি নিয়ে চেঁচে ফেলতে হবে।

বড় লন হলে লন ঘিরে টেকোমা গাউডিচাউডি-করিজিয়া স্পেসিওসা-জারুল রোজিয়া-মান্দুন্দা-ফুরুস এলবা এবং কেশিয়া ল্যাংকাস্টেরি ফুলের গাছ এক সার করে লাগিয়ে দেবেন। ছোট লনে দেবেন রঙ্গন বা সিংঙ্গল জবার ভেতরে লক্ষী-সানসেট্-মাই বিউটি।

॥ বারান্দা সাজাবার গাছ ॥

রোদ পাওয়ার সময়ের তারতম্য অনুসারে বারান্দাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। (ক) অনেক সময় রোদ পায়, (খ) শুধু সকালে রোদ পায় এবং (গ) মোটেই রোদ পায় না। রোদ পছন্দ করে এবং তাদের দিয়ে বাগান সাজানো যায় এমন গাছের সংখ্যা প্রচুর। শুধু রোদ থাকলেই হবে না, দেখতে হবে,—তারা রোদ ভালবাসে কিনা। এদের যত্ন কৃষ্টি বারান্দার ফুল বাগানের মত। যারা সকালের রোদ পচ্ছন্দ করে আর অন্য সময় রোদ না হলেও চলে এমন কিছু গাছ থাকলেও জানতে হবে তারা টবে চলবে কিনা। পাতাবাহার ড্রেসিনা এই পর্যায়ে পড়ে। শুধু গাছ ছায়া পছন্দ করে এটা হলেই চলবে না,—জানতে হবে, তারা কষ্টসহিষ্ণু তো? অনেকে অন্য কোন জায়গায় গাছ তৈরি করে বারান্দায় এনে সাজান। টবের গাছ যখন অতিরিক্ত বড় হয়ে যাবে তখন টব টেকে তাদের জমিতে লাগাতে হবে।

টবের ফুল চাষে প্রত্যেক বছর নতুন সার মাটি দেওয়া, টব পালটে লাগান, তরল সার প্রভৃতি দেওয়া যত্নের সংগে করতে হবে। বারান্দায় যাতে কাদা মাটি না লাগে তার জন্য ফুলগাছ শুদ্ধ টব আরেকটি বড় টবে বসিয়ে দেবেন যে বড় টবটায় জল বেরবার জন্য কোন ফুটো নেই। বারান্দার ফুলগাছে গাছকে সুন্দরতর করবার জন্য ছোট পিচকারি বা স্প্রে-মেশিনে জল দিয়ে পাতার ওপর-নিচ ধুয়ে দেবেন।

॥ বারান্দা সাজাবার গাছ ও তাদের পরিচয় ॥

অনেক সময় রোদ চায়	শুধু সকালের রোদ চায়	রোদ না হলেও চলে
এমারিলিস্-রজনীগন্ধা-সর্বজয়া	চলবে	×
×	এগেভ ও ফুরক্রেয়া	×
×	×	এমারিলিস্ ভেরিগেটা
×	কেয়া	×
×	কোলিয়াস্	×
×	×	ডিফেন্‌বাকিয়া
নয়নতারা বা ভিনকা	নয়নতারা বা ভিনকা	নয়নতারা বা ভিনকা
×	×	পাম
×	×	বাঁশ (বেম্বুসার) ও ঘাস ভেরিগেটা
×	বিগোনিয়া ও ইমপেশেন্স	×
×	রজনীগন্ধা ভেরিগেটা	×
×	সর্বজয়া ভেরিগেটা	×

"ফলের চাষ বারমাস,
ফুলের চাষ বারমাস,
না করলেই সর্বনাশ !"

পৌষ-সংক্রান্তির দিনে গ্রামের মানুষ যেমন কাক-ডাকা ভোরে গান গায়, তেমনি ফলফুল চাষি ভাইকে ওপরের শ্লোকটা সবসময়ে মনে মনে আওড়াতে হবে। এবং প্রতি মাসে তার কি কাজ সেটা ছক্-বাঁধা থাকলে সুবিধাটা অনেক। এখানে যতগুলি ফলের উল্লেখ করা হয়েছে সবই বহুবর্ষজীবী। ঝামেলা হচ্ছে ফুলকে নিয়ে। ঠগ্ বাছতে গাঁ উজাড়ের মতো দেখা যাবে অধিকাংশই একবর্ষজীবী বা কয়েক মাসের। সুতরাং মাস-নামচায় ফুলের প্রাধান্যই বেশি। মাসিক কাজে প্রথমে বাংলা মাস এবং বন্ধনীর মধ্যে ইংরেজি দুমাসের ১৫ দিন করে ধরা হয়েছে।

বৈশাখ (১৫ই এপ্রিল থেকে ১৫ই মে) ॥ ফলফুল গাছে যাতে প্রচণ্ড

তাপ না লাগে তার ব্যবস্থা করা। জলের যেন অভাব না হয়। ভাল ফল-ফুল গাছ যাতে বেশি পরিমাণে জল পায় তার জন্য গোড়াকে ঘিরে গোল করে মালসিং বা গোড়া উঁচু করে দিতে হবে। ফলে গোড়া অনেক বেশি সময় জল ধরে রাখতে পারবে। সবচেয়ে বড় লাভ গাছের গোড়ায় জল না দেওয়ার খাটুনি।

ঘন বর্ষার দিনে ফুটবে এমন মরশুমী ফুলের (দোপাটি প্রভৃতি) বীজ এ সময়ই লাগাতে হবে। দীর্ঘ বহুবর্ষজীবী যেসব গাছে কলম চড়াতে চান তাদের জন্য গর্ত করা আর সারের ব্যবস্থা এসময়ই করতে হবে। লনের কাজে মাটি তোলা করার পালা এবার এসময়ই করতে হবে। ডালিয়া গাছের কচি ডাল নিয়ে কাটিং করার জন্য যে সব গাছ রেখেছিলেন তাদের জল প্রভৃতি দিয়ে যত্ন করার পালা এবার।

গরমের দিনে রেড্ স্পাইডার মাইটদের উপদ্রব বেশি। মোরেস্টান প্রভৃতি কীটনাশক ওষুধ দিয়ে পোকাদের ধ্বংস করুন এবেলায়।

জ্যৈষ্ঠ (১৫ই মে থেকে ১৫ই জুন)॥ জ্যৈষ্ঠের গরমের দিনগুলিতে যত্ন বৈশাখের মত হবে। অনেক সময় দু-একদিন বর্ষার পর হঠাৎ খরা আসে। খরা এলে গাছ যাতে না মরে যায় তার জন্য জল দেবার ব্যবস্থা করতে হবে।

ভাল বৃষ্টি হলে মালসিং উঠিয়ে ফেলবেন। গাছের অতিরিক্ত জল পাওয়া বন্ধ করতে জল নিকাশির ব্যবস্থা নিন। লনের কোথাও জল জমলে সেই গর্ত বা নিচু হওয়া জায়গায় গুঁড়ো মাটি দিয়ে উঁচু করে দিন। নতুন তৈরি লনে ঘাসের গোছা বা কাটিং লাগান এসময়ে। পুরানো লনে পাতা পচা সার বিছিয়ে দিন এসময়টায়। বর্ষা ভালভাবে আরম্ভ হলে বহুবর্ষজীবী ফলফুল গাছের কাটিং ও গুটিকলম তৈরিতে হাত লাগান। বর্ষার দিনে জবা গাছে বিটেল পোকা লাগে এবং গাছের ক্ষতি করে। ম্যালথিওন্ প্রভৃতি কীটনাশক ওষুধ দিয়ে তাড়ান ওদের।

আষাঢ় (১৫ই জুন থেকে ১৫ই জুলাই)॥ আষাঢ় বর্ষার মাস। তাই জ্যৈষ্ঠের বৃষ্টির দিনের যে ব্যবস্থাগুলি নিয়েছিলেন এখানেও তাই। ডালিয়ার যে সব গাছ মাঝখান থেকে ছেঁটে দেবার দরকার তাদের এ মাসের শেষ-দিকে ছেঁটে দেবেন। ডালিয়ার কাটিং নেবার মূল গাছগুলিতে অল্প পরিমাণ ইউরিয়া পাতার সার হিসেবে প্রয়োগ করলে তা আরও ভাল কাটিং পেতে সাহায্য করবে। লনের ঘাস বর্ষার সময়ে বড় রাখতে হয়। লনে কেঁচো তোলার

মাটির ঢিপি ভেঙ্গে দিন। চুন দেবার প্রয়োজন দরকার মনে করলে এ সময়ে দেবেন। গোলাপের জমিতে চুন দিতে হলে এসময়ে দিন। টবের গাছের উপরের সারমাটি পালটান বা বাড়তি সার দেওয়া বা টব পাল্টে লাগাবার এটাই ভাল সময়। খাল-বিল-জলাশয় বা কৃত্রিম জলাধারে পদ্ম গাছ লাগাবার এটাই উপযুক্ত সময়। সাবধান! গাছের ফাংগাস রোগ এ সময়টায় মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।

শ্রাবণ (১৫ই জুলাই থেকে ১৫ই আগষ্ট)॥ শ্রাবণ মাসের শেষ দিকটায় ডালিয়ার কাটিং বসাতে আরম্ভ করবেন। শীতের যেসব মরশুমী ফুলগাছ ফুল দিতে সময় বেশি নেয়, তাদের এ মাসের শেষ দিকটায় গামলা-টবে বসাবেন।

খুব তাড়াতাড়ি আর বেশি দিনের জন্য গোলাপ ফুল পেতে শ্রাবণের শেষে গোলাপ ফুল গাছ লাগাতে হবে। বহুবর্ষজীবী ফলফুল গাছের বীজের চারাগুলি তুলে নার্শারি টবে লাগানোর এটাই ঠিক সময়। এমাসেও জমিতে ভালভাবে চুন ছড়াতে হবে।

ভাদ্র (১৫ই আগষ্ট থেকে ১৫ই সেপ্টেম্বর)॥ শীতের মরশুমী ফুলের বীজ ভাদ্রের মাঝামাঝি থেকে লাগাবেন। গ্লাডিওলাস্ এ মাসে বেশ ভালোভাবে লাগানো যেতে পারে। পালা করে দিন পনের অন্তর গ্লাডিওলাস্ লাগালে অনেকদিন ধরে ফুল পাওয়া যাবে। ভাদ্র মাসের শেষ দিকে ডালিয়ার কচি গাছ লাগানো যায়,—ফুল তাহ'লে পাওয়া যাবে নভেম্বরে।

আশ্বিন (১৫ই সেপ্টেম্বর থেকে ১৫ই অক্টোবর)॥ ভাদ্রে যদি শীতের মরশুমী ফুলের বীজ না লাগানো হয়ে থাকে তবে পুরো আশ্বিন মাস ধরে একাজটি করতে হবে। মাসের শেষের দিকে লাগানো বীজ ফুল পেতে অবশ্য দেরি হবে। আশ্বিনের ঝড়ে যাতে ফলফুলের গাছের ক্ষতি না করে তার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

কার্তিক (১৫ই অক্টোবর থেকে ১৫ই নভেম্বর)॥ ডালিয়ার কেয়ারি বা সারি এখন থেকে পাশাপাশি না করে একটু নিচু করে করবেন। এ মাসের শেষের দিকে গোলাপ লাগালে মন্দ নয়, তবে ফুল পেতে বেশ দেরি হবে। বর্ষা পুরোপুরি থেমে গেলে এ মাসেই গোলাপ গাছ ছাঁটবেন। গাছ ছাঁটার পরেই গোলাপের গোড়ার মাটি খুঁড়ে দেবার উপযুক্ত মনে করলে সেটাও করে দেবেন।

অগ্রহায়ন (১৫ই নভেম্বর থেকে ১৫ই ডিসেম্বর)॥ গোলাপের কুঁড়ি বাড়তে আরম্ভ করলে গাছে নিয়মিতভাবে তরলসার দেওয়ার প্রয়োজন। গোলাপে পাতার দুটি সারও এ মাস থেকে আরম্ভ করা যাবে। শীতকালেই ঘাসের লন দেখতে সবচেয়ে সুন্দর। তার জন্য এসময়ে লনের ঘাস ছোট করে কেটে এর সৌন্দর্য অনেক বাড়িয়ে দেওয়া দরকার। গরমের প্রথম দিকে শীতের যেসব মরশুমী ফুল ফোটে তাদের বীজ এসময়ে লাগানো যেতে পারে।

পৌষ (১৫ই ডিসেম্বর থেকে ১৫ই জানুয়ারি)॥ পুরো শীতের মরশুম এটা। বিভিন্ন ফুল ফোটে এসময়। তাই ভাল ফুল পেতে নিয়ম-মাফিক তরলসার দিয়ে যেতে হবে। ডালিয়ার লেট-কাটিং আরম্ভ হবে এ মাসের প্রথম দিকে। একাজ চালিয়ে যেতে হবে যতদিন সম্ভব। গোলাপের চোখ কলমের জন্য এমাস ও তার পরের মাস খুব ভাল সময়। সারা পৌষটাই জবা গাছ লাগাবার সময়।

মাঘ (১৫ই জানুয়ারি থেকে ১৫ই ফেব্রুয়ারি)॥ গরমকালের মরশুমী ফুলের বীজ পুঁতবার সময়ই হলো মাঘ মাস। মাঘ মাস বহুবর্ষজীবী ফুলগাছ লাগাবার খুব ভাল সময়। মাঘ মাসের শেষ দিকে অনেক সময় কিছুটা গরম পড়ে। তাই গাছের জলের পরিমাণটা বাড়িয়ে যেতে হবে। গোলাপের চোখ কলমও মাঘের গোড়ার দিকে করা মন্দ নয়।

ফাল্গুন (১৫ই ফেব্রুয়ারি থেকে ১৫ই মার্চ)॥ পরের বছরের জন্য এ সময়ই ডালিয়া টবে তুলে নেবেন। যতদিন গাছ বেঁচে থাকবে জল দিয়ে যাবেন। গাছ মরে গেলে জল দেওয়াও বন্ধ করবেন। জবার চোখ কলম এই মাস ও পরের মাসে বেশ ভাল হয়। বহুবর্ষজীবী ফলফুল গাছের বীজ জুতবার বেশ ভাল সময় হ'ল ফাল্গুন মাস। গরম আরম্ভ হলে পাতাবাহার বা বাহারিপাতার গাছকে পুরোপুরি রোদের আওতা থেকে সরিয়ে আনতে হবে। পাতা পচা সার-গোবরসার-কম্পোস্টসার তৈরি করার পক্ষে ফাল্গুন মাস খুব ভালো সময়।

চৈত্র (১৫ই মার্চ থেকে ১৫ই এপ্রিল)॥ বর্ষাকালের প্রথম দিকে ফুল দেবে এরকম মরশুমী ফুলের বীজ এ মাসের প্রথম থেকে লাগানো যাবে। লনের ঘাস বীজ দিয়ে তৈরি করতে চাইলে চৈত্র মাস উপযুক্ত। অনেক সময় চৈত্র মাসে প্রচণ্ড গরম পড়ে। এই গরমের হাত থেকে গাছপালা বাঁচাতে তাদের উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে এবং গাছ বেশি জল যাতে পায় তারও ব্যবস্থা করতে হবে।

———